বিজ্ঞানের বিস্ময়
এক্স-রে

ডাঃ নাজমুল আলম

আহমদ পাবলিশিং হাউস

সূচীপত্র

এক্স-রের ইতিহাস ৯
অদৃশ্য আলোক ১০
পদার্থ হতে শক্তি ১২
পরমাণুর গঠন ১৩
এক্স-রে এক ধরনের বিকিরণ ১৫
তেজস্ক্রিয়তার রূপরেখা ১৬
এক্স-রে কুইজ–১.১৬
রেডিও আইসোটোপ : মানব কল্যাণে ১৭
ক্যাথোড রশ্মি ও টিউব ১৮
পদার্থের রূপান্তর ও তেজস্ক্রিয় ক্ষয় ১৯
এক্স-রে এক অদৃশ্য শক্তি ২০
এক্স-রে আসে কোথা থেকে ২১
এক্স-রে ও পদার্থের ক্রিয়া-বিক্রিয়া ২৩
বিদ্যুৎ চলে ঢেউয়ের দোলায় ২৪
এক্স-রে টিউব একটি বায়ুশূন্য কাঁচ নল ২৬
এক্স-রে জেনারেটর ঃ শক্তির উৎস ২৮
এক্স-রে ট্রান্সফর্মার ঃ শক্তি বাড়ায়-কমায় ২৯
এক্স-রে অটো ট্রান্সফর্মার ৩০
এক্স-রে সার্কিট ৩১
ওহম-ভোল্ট-এম্পিয়ার–নিত্যদিন ব্যবহার ৩২
এক্স-রে রেকটিফায়ার ঃ একান্ত প্রয়োজনে ব্যবহার ৩৩
এক্স-রে কুইজ–২. ৩৪
এক্স-রে থেরাপী টিউব ৩৫
মানব কল্যাণে এক্স-রে ৩৬
এক্স-রের পরিচয় ঃ রনজন নামে ডাকো ৩৭
এক্স-রে ফিল্টার ৩৮
কোনস, কলিমেটর, ডায়াফ্রাম ৩৯
এক্স-রে ফিল্ম ৪০
ফিল্ম ঃ এক্স-রে বনাম ফটোগ্রাফী ৪১
ছবি বিবর্ধক পর্দা ৪২
এক্স-রে গ্রীড ৪৩
এক্স-রে ডেভেলপার ৪৪
এক্স-রে ফিক্সার ৪৫
অন্ধকার ঘরে ছবি তৈরি ৪৫
অটোমেটিক ফিল্ম প্রসেসিং ৪৬
ডার্ক রুম পরিকল্পনা ৪৭
ডার্ক রুম সমস্যা ৪৮
এক্স-রে প্রতিবিম্ব ৪৯
এক্স-রে ফিল্মের ঘনত্ব ৫০
মেমোগ্রাফী ৫১
কন্ট্রাষ্ট মেটেরিয়াল ৫২
এক্স-রে কুইজ–৩ ৫২
বিকিরণের বিপদ ৫৩
রেডিয়েশন ডিটেকটর ৫৪
সিটি স্ক্যান ৫৫
বিকিরণ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ৫৭
এক্স-রে কুইজ–৪ ৫৮
ফিল্মে বিকিরণ প্রক্ষেপণের পরিমাপ ৫৯
রেডিও ও গ্রাফিক কন্ট্রাষ্ট ৬০
সিনটিলেশন ডিটেকটর ৬১
রেডিয়েশন ডিটেকটর ঃ টি এল ডি ৬২
রেডিয়েশন ডিটেকটরঃপকেট ডোজিমিটার ৬২
ফিল্ম বেজ কি কাজে লাগে ৬৩
এক্স-রে কুইজ-৫. ৬৩
গ্রন্থপঞ্জী ৬৪

এক্স-রের ইতিহাস

এক্স-রের আরেক নাম অজানা রশ্মি, যার আবিষ্কারক হলেন অধ্যাপক রঞ্জন। তার পুরো নাম উলহেলম কোনরাড রঞ্জন। ১৮৪৫ সালে জার্মানীর একটি পর্ণগ্রামে জন্মেছেন তিনি। সুদীর্ঘ ৭৮ বছর বয়সে ১৯২৩ সালে তাঁর এ সার্থক জীবনের মহাবসান ঘটে।

একটি দু-মুখওয়ালা কাঁচের টিউবে দু'খানি ধাতব প্লেট বসিয়ে তার ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ চালনা করলে দেখা যায়, বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ আকাশে বিজলী চমকানোর মতই আঁকাবাঁকা গতিতে এগিয়ে চলে। এখন যদি এ টিউবটি হতে এয়ার-পাম্পের সাহায্যে বাতাস বের করে নেয়া যায়, তখন স্ফুলিঙ্গ দেখা যাবে সরল রেখার আকারে। এ মূলনীতিটিকে মূলধন করে বিজ্ঞানীরা এগিয়ে গেলেন উন্নততর গবেষণায়।

প্রথম আসেন প্লুকার নামের এক বিজ্ঞানী। তিনি পরীক্ষণীয় কাঁচের নলটি হতে বায়ুর চাপ কমাতে কমাতে হঠাৎ লক্ষ্য করলেন, যেখান থেকে বিদ্যুৎ বেরিয়ে যায়, ঠিক সেখান হতেই এক চমৎকার আলোকচ্ছটা বের হয়ে সমগ্র টিউবটিকে আলোময় করে তোলে। এ অদ্ভুত রশ্মির নাম 'ক্যাথোড-রশ্মি।' দিনে দিনে এও প্রমাণিত হয়েছে, ক্যাথোড রশ্মি সমষ্টিগত বিদ্যুৎ কণা ছাড়া আর কিছুই নয়।

সেদিন জার্মানে ক্যাথোড-রশ্মি গবেষকদের মধ্যে অধ্যাপক রঞ্জন অন্যতম। চরম পাওয়ার দিনটি মাত্রই স্মরণীয়। রঞ্জন একাগ্রচিত্তে গবেষণায় নিরত। সেদিন তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল ক্যাথোড-টিউব। তাঁর এ টিউবের মাঝখানেও আরেকটি প্লেট বসানো ছিল। টিউবটির ভেতর দিয়ে আলোকচ্ছটা নিয়মিত চলতে থাকল। ভাগ্য জোরেই সামনে ছিল একখানা বেরিয়াম প্লাটিনো সায়ানাইড প্লেট।

এসব প্লেটের একটা বৈশিষ্ট্য হলো– যে কোন ধরনের তেজের সামনেই এরা ঝলসে ওঠে। প্রথমে তেজ শোষণ করে নেয় ও পরে সে তেজ বিকিরণ করতে পারে। রঞ্জন হঠাৎ দেখলেন, সামনের প্লেটখানি আলো ঝলমল করছে। তিনি প্রথমে ভেবেছিলেন, নিশ্চয়ই টিউব হতে রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়ে পর্দায় পড়ছে, আর এতেই পর্দাখানি ঝলমল করছে। এ ভেবে তিনি একখানা ক্যানভাস জাতীয় মোটা কাপড় দিয়ে টিউবটি ঢেকে দেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। পরে তিনি হাতের কাছে একখানা কার্ডবোর্ড পেলেন। তাই দিয়ে গোটা টিউবকে ঢেকে দেন। তবুও দেখা গেল, রশ্মি বিচ্ছুরণ অনুমাত্রও কমেনি।

ভয়ে উত্তেজনায় তাঁর দেহ কাঁপছে। নাড়ীর টান মিনিটে আট দশক পেরিয়ে গেছে। নিরুপায় হয়ে তিনি নিজের হাতখানাই টিউবের সামনে ধরলেন। আজব কাণ্ড! হাতের ছবিই পর্দায় পড়েছে। সম্পূর্ণ কংকালসার, মাংস-পিণ্ডের চিহ্নমাত্রও নেই। একি!

banglainternet.com

নিমিষেই তিনি এক নতুন রশ্মি আবিষ্কার করে ফেলেছেন, যার জন্য তিনি সেকেণ্ড আগেও প্রস্তুত ছিলেন না।

চরম প্রাপ্তির এ সময় তিনিও কি আর্কিমিডিসের মতো 'ইউরেকা', 'ইউরেকা' (অর্থাৎ পেয়েছি, পেয়েছি) বলে নগরীর রাজপথে চেঁচাতে লাগলেন, সে সত্য আমাদের জানা নেই। প্রতিটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পেছনেই রয়েছে এমনি এক রহস্যময় অজানা ইতিহাস।

গবেষণার দৃষ্টিতে এ রশ্মিকে বিভাজিত করলে দেখা যায়, ক্যাথোড রশ্মি মধ্যখানের প্লেটে যখনি ধাক্কা খায়, তখনি প্লেটখানা সমস্ত বিদ্যুৎ কণা চুষে নেয় এবং এ অত্যাশ্চার্য রশ্মি বিকিরণের সৃষ্টি করে; যা কাঁচ, কাঠ, কার্ড বোর্ড ইত্যাদিকে অনায়াসেই অতিক্রম করে যেতে পারে। এরি নাম এক্স-রে বা অজানা রশ্মি। আবার অধ্যাপক রঞ্জনের নাম হতে এর অন্য নাম 'রঞ্জন রশ্মি।' বিজ্ঞানের জগতে এ এক অভিনব যুগান্তর বই কি!

অদৃশ্য আলোক

আমাদের দৃষ্টি সীমার বাইরে বহু রকমের আলোক রশ্মি প্রতিনিয়ত পৃথিবীতে আছড়ে পড়ছে। এসব অদৃশ্য আলোকের বেশীর ভাগই অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন। পদার্থের পরমাণুর নিউক্লিয়াস এবং চার্জ ধারণকৃত কণিকাদের বিবিধ কর্মকাণ্ডের ফলে সৃষ্ট এসব অদৃশ্য আলোক গোটা বিশ্ব জগতকে আলোকিত করে রাখছে। অতি বেগুনী রশ্মি, রঞ্জন রশ্মি, গামা রশ্মি, কসমিক রশ্মি ইত্যাদি তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের ঢেউয়ে সব সময়ই জ্যোতিষ্কমণ্ডলী প্লাবিত হচ্ছে।

সূর্য ও অন্যান্য নক্ষত্র হতে পৃথিবীতে কসমিক রশ্মি এসে পড়ছে। এই কসমিক রশ্মি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রোটন, মেসন, নিউট্রন, আলফা কণিকা, পাই-মেসন, মিউ-মেসন ইত্যাদি। আরেকটি উৎস হতে পরিবেশে প্রতিনিয়ত তেজ সঞ্চালিত হচ্ছে। তা হলো ভূগর্ভে অবস্থিত বিভিন্ন রেডিও একটিভ বা তেজস্ক্রিয় পদার্থ। যেমন– ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম, একটিনিয়াম, নেপচুনিয়াম ইত্যাদি। এরা তেজ বিকিরণের মাধ্যমে ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। এভাবে ক্ষয় হতে হতে এক সময় এরা সবাই লেড বা সীসায় পরিণত হবে, যারপর এদের আর ক্ষয় নেই।

দেহের ভেতর প্রতিস্থাপিত কোন তেজস্ক্রিয় পদার্থও পরিবেশে ক্ষতিকর বিটা বা গামা রশ্মি ছড়ায়। এসব তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ সমূহের নাম কার্বন–১৪, ষ্ট্রনশিয়াম–৯০ এবং পটাশিয়াম–৪০। পরিবেশে কৃত্রিম বিকিরণের আরো কিছু কারণ রয়েছে। যেমন–মেডিক্যাল ও ডেন্টাল এক্স-রে, রেডিও আইসোটোপ সেন্টার, নিউক্লিয়ার রিয়েক্টর, পারমাণবিক চুল্লী ও বোমার প্রস্তুতি এবং পরীক্ষা কেন্দ্রসমূহ।

banglainternet.com

রেডিও-একটিভ বা তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলো যে রশ্মি বা তেজ বিকিরণ করে তা তিন ধরনের–১. আলফা রশ্মি, ২. বিটা রশ্মি, ৩. গামা রশ্মি।

আলফা-রেডিয়েশন

একে আলফা পার্টিক্যাল নামেও ডাকা হয়। এটি মূলত দু'টি প্রোটন ও দুটি নিউট্রন কণিকার সমষ্টি। এর গতি আলোর গতি হতে কম, প্রায় ১–৩×১০^{৮} মিটার/সেকেণ্ড। আলফা কণিকার আয়োনাইজেশন ক্ষমতা খুব তীব্র। সামান্য একখানা কাগজের টুকরো এর গতি থামাতে পারে।

বিটা রেডিয়েশন

এটি মূলত উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ইলেকট্রন কণার সমষ্টি। বিটা পার্টিক্যাল আলোর গতিতে চলে। এর ভেদ ক্ষমতা আলফা হতে অনেক বেশি। কয়েক মিলিমিটার সীসার পাত দিয়ে এর গতি রোখা যায়।

গামা রেডিয়েশন

এটি আলোর গতি সম্পন্ন ইলেকট্রো-মেগনেটিক রেডিয়েশন বা তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ। এর ভেদ ক্ষমতা অন্য দু'টি হতে অনেক বেশি। গামা রশ্মির শক্তি প্রায় ১.২৪–১.৪৮ মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট। এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ০.০১ হতে ০.১ এংস্ট্রোম। কম্পাংক ৩×১০^{২০} হার্টজ/সেকেণ্ড। গামা রশ্মি জীবকোষের জন্য ক্ষতিকর। (এংস্ট্রোম তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের একক। ১ এংস্ট্রোম = ১০$^{-১০}$ মিটার। ইলেকট্রন ভোল্ট নিউক্লিয়ার শক্তির একক। এক ইলেকট্রন ভোল্ট = ১.৬৬×১০$^{-১৯}$ জৌলস)

যেসব শক্তির কণা বা এনার্জি পার্টিক্যাল শূন্যস্থানে আলোর গতিতে চলে, তাকে ফোটন বলে। বিভিন্ন উৎস হতে আগত ফোটন সমষ্টির ভেদ ক্ষমতা বিভিন্ন রকমের। তাদের কম্পাংক ও তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে। তারা তড়িৎ ও চৌম্বক ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করে। বিভিন্ন প্রকার তড়িৎ–চুম্বকীয় তরঙ্গের নাম–১. রেডিও ওয়েভ, ২. ইনফ্রায়েড বা অবলোহিত রশ্মি, ৩. দৃশ্যমান আলোক, ৪. আলট্রা-ভায়োলেট রে, বা অতি বেগুনী রশ্মি, ৫. রঞ্জন রশ্মি, ৬. গামা রশ্মি, ৭. বিভিন্ন বিকিরণ সৃষ্টিকারী যন্ত্র। যেমন–বিটাট্রন, সাইক্লোট্রন, লিনিয়ার এক্সিলারেটর ইত্যাদি হতে উৎপন্ন তরঙ্গ।

রেডিও-ওয়েভ

বেতার তরঙ্গ পাঠানোর কাজে শক্তির এই ঢেউ ব্যবহৃত হয়। বৈদ্যুতিক কম্পনের ফলে এটি সৃষ্ট। এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এক সেন্টিমিটার হতে তিন কিলোমিটার পর্যন্ত। কম্পাংক ৩.০×১০^{১০} হার্টজ/ সেকেণ্ড। শক্তি প্রায় ১২৪ হতে ৩০০ মাইক্রো ইলেকট্রন ভোল্ট।

BanglaBook.org

অবলোহিত রশ্মি

রেডিও-ওয়েভ হতে কম তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ঢেউ অবলোহিত রশ্মি। এর শক্তি প্রায় ০.৫ হতে ১.২৪ ইলেক্ট্রন ভোল্ট। কম্পাংক প্রায় ৩×১০^{১২} হার্টজ/সেকেণ্ড। তরঙ্গ দৈর্ঘ্য .০০১ সেন্টিমিটার।

দৃশ্যমান আলোক

এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ৪০০০–৭০০০ এংস্ট্রোম। (এক এংস্ট্রোম=১০$^{-১০}$ মিটার)। শক্তি ১.৭৭ হতে ৩.১০ ইলেকট্রন ভোল্ট। কম্পাংক ৭.৫×১০^{১৪} হার্টজ/সেকেণ্ড। পরমাণুর বহিঃইলেক্ট্রনের কম্পনের ফলে এটা সৃষ্ট। বাতি ও গ্যাস টিউবে বিদ্যুৎ ক্ষরণের ফলেও এটা সৃষ্টি হয়।

অতি বেগুনী রশ্মি

দৃশ্যমান আলোক হতে কম তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের শক্তি অতি বেগুনী রশ্মি যার ক্ষমতা ৩.১ হতে ১২৪ ইলেক্ট্রন ভোল্ট। তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ১০০–৪০০০ এংস্ট্রোম।

রঞ্জন রশ্মি

তীব্র ক্ষমতাসম্পন্ন ইলেক্ট্রন প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে রঞ্জন রশ্মি উৎপন্ন করা হয়। এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ০.০১ হতে ০.১ এংস্ট্রোম। শক্তি ১২.৪ হতে ১২৪ কিলো ইলেক্ট্রন ভোল্ট। কম্পাংক প্রতি সেকেণ্ড ৩×১০^{১৮} হার্টজ। ঢেউয়ের কম্পাংক বাড়ার সাথে সাথে শক্তির পরিমাণও বাড়ে। গামা রশ্মি ও রঞ্জন রশ্মির মতোই যা পূর্বে বলা হয়েছে।

আলো ঝলমল এ বিশ্ব! এখানে শুধু আলোরই রাজত্ব!

পদার্থ হতে শক্তি

এ পৃথিবী বস্তুময়। অজস্র পদার্থের সমন্বয়ে এ বস্তু জগৎ তৈরি। পদার্থ বলতে আমরা বুঝি, যার ওজন আছে ও স্থান দখল করে, তাহাই। পদার্থ দু'ধরনের–মৌলিক ও যৌগিক। মৌলিক পদার্থ একক বস্তু দিয়ে তৈরি। একে ভাঙলে সে পদার্থ ছাড়া অন্য কোন পদার্থের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। যেমন–সোডিয়াম, ক্লোরিন ইত্যাদি।

যেসব পদার্থকে ভাঙলে সে পদার্থ ছাড়া অন্য পদার্থের গুণাবলী পাওয়া যায়, তাদেরকে যৌগিক পদার্থ বলে। যেমন–পানি। এটা ভাঙলে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পাওয়া যায়। এ যাবৎ আবিষ্কৃত মৌলিক পদার্থের সংখ্যা ১০৫টি। তাদের মধ্যে বিরানব্বুইটি প্রাকৃতিক, অন্যগুলো কৃত্রিমভাবে তৈরি।

banglainternet.com

পদার্থ মাত্রই অণু-পরমাণুর সমন্বয়ে তৈরি। অণু পরমাণু হতে বড়। পরমাণুর সমন্বয়ে অণু গঠিত। অণু মৌলিক বা যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা, যা সচরাচর মুক্ত অবস্থায় অবস্থান করতে পারে। যেমন– হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের পরমাণু একত্রিত হয়ে পানির অণু গঠন করে। আর পরমাণু হলো মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা, যা সচরাচর রাসায়নিক ক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে।

প্রতিটি পদার্থকে শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। এ সত্যটি প্রথম উদ্ভাবন করেন আলবার্ট-আইনস্টাইন। সেটাই আইন-স্টাইনের সূত্র নামে পরিচিত। কোন বস্তু হতে উৎপন্ন শক্তির পরিমাণ সেটার ভর এবং আলোর গতির বর্গের গুণফলের সমান। ধরা যাক, শক্তি = E, ভর = m; আলোর গতি, C = ৩×১০^{৮} মিটার/ সেকেণ্ড। অতএব, $E = mc^2$। অর্থাৎ শক্তি=ভর × (আলোর গতি)^{২}।

এক গ্রাম পদার্থকে শক্তিতে রূপান্তরিত করলে ৯ × ১০^{১৩} জৌল শক্তি উৎপন্ন হয়, যা দিয়ে চার হাজার বাড়িতে এক বছরের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যাবে।

পরমাণুর গঠন

পরমাণুর কেন্দ্রস্থলে থাকে নিউক্লিয়াস বা প্রাণকেন্দ্র। নিউক্লিয়াসের ভেতর প্রোটন ও নিউট্রন কণিকা জড়াজড়ি অবস্থায় রয়েছে। বাইরের বৃত্তাকার কক্ষপথগুলোকে 'শেল' বলে। তাদের বিভিন্ন নাম যেমন–K, L, M, N, O। কক্ষপথে ইলেকট্রন কণিকারা ঘূর্ণরত অবস্থায় থাকে। এক কৌণিক ভরবেগের প্রভাবে ইলেকট্রনরা সব সময় ঘুরছে। সৃষ্টির পরমুহূর্ত থেকেই ওরা ঘুরন্ত অবস্থায় রয়েছে।

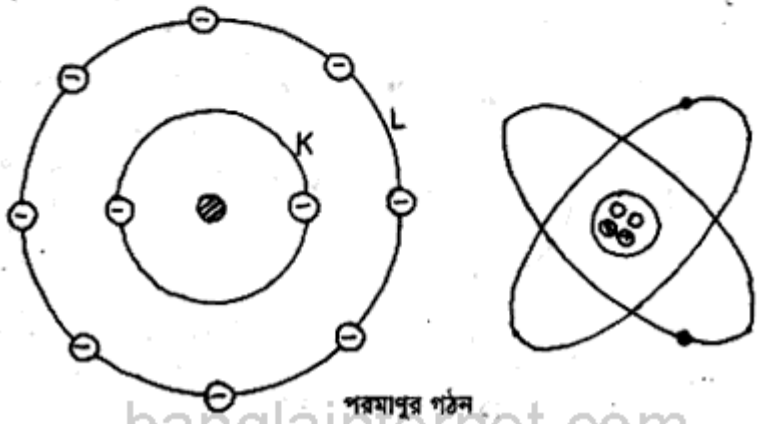

পরমাণুর গঠন

banglainternet.com

বিভিন্ন কক্ষপথে ভিন্ন ভিন্ন রকমের শক্তি থাকে। ভেতরের কক্ষপথে শক্তি বেশি, বাইরের দিকে অপেক্ষাকৃত কম। একে বলে শক্তি স্তর বা এনার্জি লেবেল। বিজ্ঞানীরা

টাংস্টেন ধাতুর পরমাণু গবেষণা করে দেখেছেন, তার 'কে' শেলে শক্তির পরিমাণ ৭০,০০০ ইলেকট্রন ভোল্ট, 'এল' শেলে ১১,০০০ ইলেকট্রন ভোল্ট। 'এম' শেলে ২,৫০০ ইলেকট্রন ভোল্ট। এই শক্তি কক্ষপথে ঘূর্ণনরত ইলেকট্রনকে স্থানচ্যুত হতে বাধা দেয়।

পরমাণুর ধনাত্মক কণিকার নাম প্রোটন। এর ভর ১.০০৭৮ এ.এম.ইউ, (এটমিক ম্যাস ইউনিট)। এর সংখ্যাকে পারমাণবিক সংখ্যা বলে। লেখা হয় 'Z' দিয়ে। প্রোটনকে সংক্ষেপে লেখা হয় 'P' দিয়ে। পরমাণুতে ইলেকট্রন ও প্রোটনের সংখ্যা সমান।

ইলেকট্রন নেগেটিভ বা ঋণাত্মক কণিকা। এর ভর ০.০০০৬৮ এ. এম. ইউ.। সংক্ষেপে লেখা হয় e, e^-, B^- দিয়ে।

নিউট্রনের কোন চার্জ নেই। এটা নিরপেক্ষ কণিকা। এর ভর ১.০০৮৮ এ. এম. ইউ.। সংক্ষেপে লেখা হয় 'n' দিয়ে। নিউট্রন ও প্রোটনের সংখ্যাকে পরমাণুর ভর সংখ্যা বলে। তাকে 'A' দিয়ে সূচিত করা হয়।

একটি অস্থিতিশীল কণিকার নাম পজিট্রন। শক্তির সঞ্চালন কালে এটা আকস্মিক ভাবেই তৈরি হয়। একে e^+ বা B^+ দিয়ে প্রকাশ করা হয়। এটা ইলেকট্রনের সাথে বিক্রিয়া করে গামা রশ্মি উৎপন্ন করে।

নিউট্রনের মতো আরেকটি ক্ষুদে নিরপেক্ষ কণিকা নিউট্রিনো। এর সংকেত $\overset{\circ}{\underset{\circ}{V}}$। এটা প্রোটনের সাথে ক্রিয়া করে বিটা-পার্টিক্যাল উৎপন্ন করে।

$$\overset{\circ}{\underset{\circ}{V}} + P = n + B^+$$

একটি বিশেষ রকমের অস্থিতিশীল কণিকার নাম মেসন। ইহা 'পাই-মেসন' ও 'মিউ-মেসন' এ দুভাবে থাকতে পারে। পাই-মেসন রূপান্তরিত হয়ে মিউ-মেসন ও নিউট্রিনো উৎপন্ন করে।

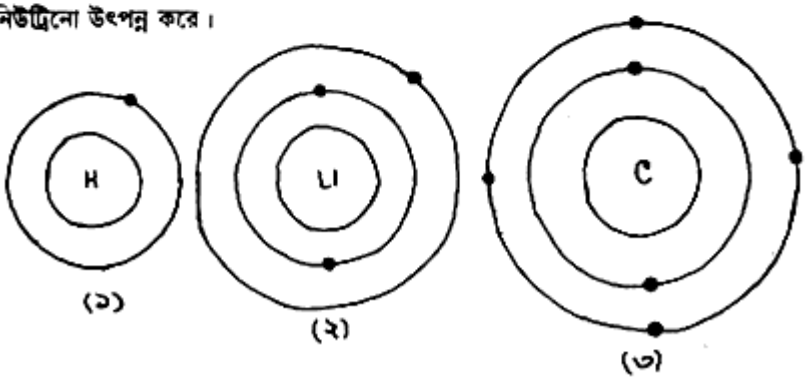

(১) হাইড্রোজেন পরমাণু
(২) লিথিয়াম পরমাণু
(৩) কার্বনের পরমাণু

banglainternet.com

এক্স-রে এক ধরনের বিকিরণ

বিকিরন শক্তি সঞ্চালনের একটি পদ্ধতি। বিকিরণ প্রক্রিয়ায় শূন্যস্থান ও গ্যাসীয় মাধ্যমে শক্তি সঞ্চালিত হয়। সূর্য হতে পৃথিবীতে তাপ আসে বিকিরণ প্রক্রিয়ায়। বলা যায়, বিকিরণ এক ধরনের অদৃশ্য শক্তি। যে শক্তির প্রভাবে পরমাণুর গঠন হতে একটি ইলেকট্রন স্থানচ্যুত হয় ও পরমাণুটি উত্তেজিত হয়ে ওঠে, তার নাম আয়োনাইজিং রেডিয়েশন। যেমন–এক্স-রে, গামা রশ্মি।

আরেক ধরনের বিকিরণ আছে। সেটা কিঞ্চিৎ দুর্বল প্রকৃতির। তার প্রভাবে কোন পদার্থের পরমাণুর ইলেকট্রন স্থানচ্যুত হয় না। তবে বহিঃ ইলেকট্রনের প্রভাবে পরমাণুর গায়ে শক্তি সঞ্চিত হয়। তার নাম 'নন-আয়োনাইজিং' রেডিয়েশন। যেমন–তাপশক্তি, শব্দ শক্তি, দৃশ্যমান আলোক।

অনেক সময় শক্তি কণার আকারে সঞ্চালিত হয়। তার নাম 'পার্টিক্যাল রেডিয়েশন।' এটা মানব দেহের জন্য ক্ষতিকর। এ দলে রয়েছে আলফা, বিটা ও গামা। আলফা কণিকারা ভারী। এরা দেহে ঢুকে গেলে স্থানীয়ভাবে বেশি ক্ষতি করে। গামা কণিকারা ক্ষিপ্র গতিসম্পন্ন। এরা ছুটন্ত বুলেটের মতো দেহের ক্ষতি করে বের হয়ে যায়। এরাও আয়োনাইজিং রেডিয়েশনের অন্তর্ভুক্ত।

অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন বিকিরণ বিদ্যুৎ ও চৌম্বক ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করে চলে। তাদের নাম তড়িৎ-চৌম্বকীয় বিকিরণ। ইংরেজীতে ইলেকট্রো-মেগনেটিক রেডিয়েশন। সংক্ষেপে ই. এম. আর (E.M.R.)। এক্স-রে এবং গামা রশ্মি এ দলে রয়েছে।

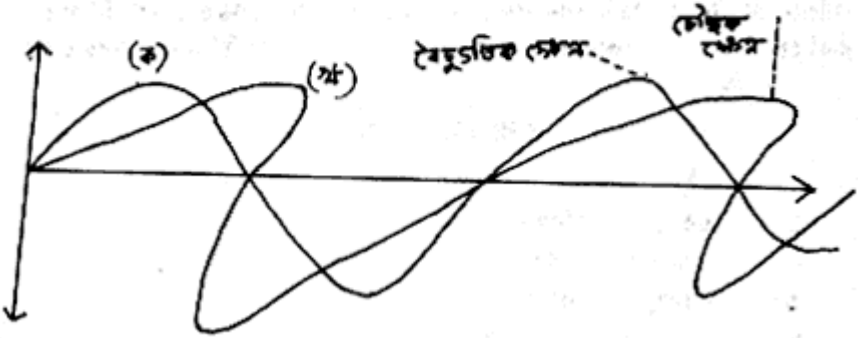

তড়িৎ চৌম্বক তরঙ্গ
(ক) বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র
(খ) চৌম্বক ক্ষেত্র

banglainternet.com

তেজস্ক্রিয়তার রূপরেখা

পৃথিবীতে এমন অনেক পদার্থ রয়েছে, যারা আপনা হতেই তেজ বিকিরণ করছে। আর ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে দিনে দিনে। তাদের নাম রেডিও একটিভ বা তেজস্ক্রিয় পদার্থ। আর এ স্বভাবটিকে বলে তেজস্ক্রিয়তা বা 'রেডিও-একটিভিটি'। মৌলিক পদার্থের তালিকায় প্রথমেই রয়েছে হাইড্রোজেন। তারপর হিলিয়াম, লিথিয়াম, বেরিলিয়াম..... ইত্যাদি। এভাবে বিরাশিতম মৌলটি হচ্ছে লেড বা সীসা। এ বিরাশিটি মৌল অতেজস্ক্রিয়। অর্থাৎ তারা আপনা হতেই প্রকৃতিতে তেজ ছড়ায় না।

ভূ-গর্ভে প্রকৃতিগতভাবে বহু তেজস্ক্রিয় পদার্থ রয়েছে। সংখ্যায় প্রায় একুশটি। মৌল তালিকায় এদের সবার স্থান সীসার পরে। এরা সবাই তেজ ছাড়ছে। আর রূপান্তরিত হচ্ছে এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায়। সবশেষে একদিন এগুলো স্থিতিশীল সীসায় পরিণত হবে। তাতে সময় লাগবে লক্ষ কোটি বছর।

প্রকৃতিতে প্রাপ্ত তেজস্ক্রিয়তার নাম 'ন্যাচারাল-রেডিও একটিভিটি।' তেজস্ক্রিয় মৌলসমূহ হচ্ছে–বিসমাথ, পোলোনিয়াম, আসটাটিন, রেডন, ভার্জিনিয়াম, রেডিয়াম, একটিনিয়াম, থোরিয়াম, প্রোটো একটিনিয়াম, ইউরেনিয়াম, নেপচুনিয়াম, প্লুটোনিয়াম, আমেরিসিয়াম, কুরিয়াম, বার্কেলিয়াম, ক্যালিফোর্নিয়াম, আইন্সটেনিয়াম, ফার্মিয়াম, ম্যান্ডেলেভিয়াম, নোভেলিয়াম, লোরেনসিয়াম। সর্বমোট একুশটি। এদের মধ্যে চারটি সিরিজ প্রধান। সেগুলো হলো–ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম, একটিনিয়াম ও নেপচুনিয়াম।

অতেজস্ক্রিয় পদার্থের মধ্যে কৃত্রিমভাবে তেজস্ক্রিয়তা সৃষ্টি করাকে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা বলে। যেমন– রেডিও কোবাল্ট। স্বাভাবিকভাবে এই কোবাল্ট বা তামা কোন তেজ বিকিরণ করে না। কিন্তু একে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন বিটাট্রন বা সাইক্লোট্রন মেশিনে নিউট্রন বা ডিউটেরন কণার দ্বারা আঘাত হেনে 'রেডিও কোবাল্টে' পরিণত করা হয়। এই রেডিও কোবাল্ট বা সংক্ষেপে ^{60}CO ক্যান্সারের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

এক্স-রে কুইজ–১

বলুন-দেখি

১। এক্স-রে কে আবিষ্কার করেন?

২। এক্স-রের শক্তি কত?

৩। পরমাণু কাকে বলে?

৪। পারমাণবিক সংখ্যা কি?

৫। নিউক্লিয়াসের চারপাশে ইলেকট্রন কণিকারা কেন সব সময় ঘুরছে?

৬। নিউক্লিয়াসে কেন প্রোটন ও নিউট্রন জড়াজড়ি করে থাকে?

৭। অতি বেগুনী রশ্মির শক্তি কত? ইহা কি কাজে লাগে?

৮। দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত?

banglainternet.com

৯। বিকিরণ কাকে বলে?
১০। কোন্ বিকিরণ দেহের জন্য ক্ষতিকর?
১১। তেজস্ক্রিয়তা কি?
১২। তেজস্ক্রিয়তার উৎস কোথায়?
১৩। কসমিক রশ্মি কোথা থেকে আসে?
১৪। তড়িৎ-চৌম্বকীয় বিকিরণসমূহ কি কি?
১৫। মৌলিক পদার্থ কাকে বলে? উদাহরণ দিন।
১৬। মৌল তালিকার প্রথম আটটি মৌলের নাম করুন?
১৭। কোন্ মৌলগুলো তেজস্ক্রিয়?
১৮। ক্যাথোড রশ্মি কি?
১৯। আইনষ্টাইনের সূত্রটি কি?
২০। গামা রশ্মি কেন ভয়ংকর?
২১। আলফা রশ্মিকে কিভাবে ঠেকানো যায়?
২২। গামা রশ্মিকে কি দিয়ে প্রতিরোধ করা যায়?
২৩। অণু ও পরমাণুর পার্থক্য কি?
২৪। সাগরের পানি নোনা কেন?
২৫। সাগরে কেন লবণের ছড়াছড়ি?

রেডিও আইসোটোপ ঃ মানব কল্যাণে

রেডিও আইসোটোপ কৃত্রিমভাবে তৈরি তেজস্ক্রিয় পদার্থ। নিতান্ত প্রয়োজনের তাগিদে বিজ্ঞানীরা এ জিনিস তৈরি করেছেন নিজেদের গবেষণাগারে। মানব কল্যাণে এর রয়েছে বহুমুখী প্রয়োগ। বিভিন্ন ধরনের জটিল রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা করা যায় আইসোটোপের সাহায্যে। মানবদেহের একটি গুরুত্বপূর্ণ আভ্যন্তরীণ অঙ্গ হচ্ছে লিভার। সেখানে যদি কোন টিউমার বা ফোঁড়া হয়, সেটা সহজেই নির্ণয় করা যায় আইসোটোপের সাহায্যে। এ কাজে ব্যবহৃত আইসোটোপের নাম টেকনিশিয়াম-৯৯ এম।

গলগ্রন্থি বা থায়রয়েড গ্ল্যান্ড দেহের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এর অবস্থান গলার সামনের দিকে। এ গ্রন্থি হতে যে প্রাণরস বের হয়, তা আমাদের দৈহিক ও মানসিক বুদ্ধিবৃত্তির সাথে জড়িত। এ গ্রন্থটির কার্যকারিতা পরীক্ষা করা যায় একটি আইসোটোপের সাহায্যে। তার নাম আয়োডিন-১৩১। এছাড়াও রয়েছে আরো বহু আইসোটোপ। সেগুলোরও ব্যবহার রয়েছে নানাবিধ জটিল রোগে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, হৃদপেশীর কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হয় থ্যালিয়াম-২০১ দিয়ে। রক্তের লোহিত কণিকার ভর নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয় ক্রোমিয়াম-৫১। ক্যান্সারের

banglainternet.com

চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয় কোবাল্ট-৬০ এবং গোল্ড-১৯৮। রক্তে লৌহের ঘাটতিজনিত রক্ত শূন্যতা নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয় ফেরাম-৫৫ ও ফেরাম-৫৯।

কৃষিক্ষেত্রেও আইসোটোপ ব্যবহৃত হয়। উদ্ভিদের রোগ, ফলন ও বয়স নির্ণয়ে আইসোটোপের সাফল্যজনক ব্যবহার সত্যিই প্রশংসনীয়। বড় বড় শিল্পক্ষেত্রে আইসোটোপ ছাড়া কাজ করা অসম্ভব। যেমন- শক্তি উৎপাদন, পদার্থের ক্ষয় নির্ণয়, নিউক্লিয়ার রিয়েকটর, চুল্লী, বোমা ইত্যাদি প্রস্তুতে আইসোটোপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার দাবি রাখে।

আইসোটোপের ব্যবহার নিয়ে এতক্ষণ সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো। প্রশ্ন আসে- আইসোটোপ কি? যে সকল পরমাণুর মধ্যে প্রোটনের সংখ্যা সমান, কিন্তু নিউট্রনের সংখ্যা ভিন্ন, তাদেরকে রেডিও আইসোটোপ বলে। যেমন-হাইড্রোজেন প্রোটন সংখ্যা-১। ডিউটেরিয়াম (প্রোটন=১, নিউট্রন=১); ট্রিটিয়াম (প্রোটন=১, নিউট্রন=২)। এরা সবাই হাইড্রোজেনের আইসোটোপ।

ক্যাথোড রশ্মি ও টিউব

ক্যাথোড রশ্মি নিয়ে বিজ্ঞানীরা বহু গবেষণা করেছেন। তাতে জানা গেল এরা ইলেকট্রনের ঝাঁক। অর্থাৎ ঋণাত্মক কণার সমষ্টি। এদের উৎপত্তি ক্যাথোড টিউব হতে। তারপর এরা সরল পথে চলে। আলোকের সাধারণ ধর্ম অনুযায়ী বাঁকা পথে এদের গতি বিঘ্নিত হয়। ক্যাথোড রশ্মি বিদ্যুৎ ও চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়। এটা পদার্থের ওপর আবর্তিত হলে তাপ উৎপন্ন হয়। গ্যাসকে আয়োনিত করার এক দুর্জয় ক্ষমতা রয়েছে এ রশ্মির।

প্রযুক্তির বিভিন্ন শাখায় ক্যাথোড-রে টিউবের ব্যবহার রয়েছে। যেমন- টেলিভিশন, কম্পিউটারের মনিটর, এক্স-রে টিউব, অসিলোস্কোপ নামক যন্ত্র ইত্যাদিতে।

ক্যাথোড টিউবের প্রধান অংশ তিনটি। প্রথমেই আসে ইলেকট্রন গান। এখানে উত্তপ্ত ফিলামেন্ট হতে ঝাঁকে ঝাঁকে ইলেকট্রন বিচ্ছুরিত হয়। তারপর বিভিন্ন সমান্তরালে বসানো প্লেটের মাঝখান দিয়ে ইলেকট্রন প্রবাহকে ধাবিত করানো হয়। এর নাম ডিফলেকটিং-সিস্টেম। এতে ইলেকট্রনের এলোমেলো গতি নিয়ন্ত্রিত হয়। তারপর ছুটন্ত ইলেকট্রন প্রবাহ গিয়ে সজোরে আঘাত হানে ফ্লুরোসেন্ট পর্দায়। সেখানে বসানো থাকে ফসফর কৃষ্টাল। এরা আলো বিকিরণের ক্ষমতাসম্পন্ন। ইলেকট্রনের ঝাঁক যে ছবি বহন করে আনে, ফ্লুরোসেন্ট পর্দায় সেটাই ফুটে ওঠে।

এ মূলনীতির ওপর তৈরি হয়েছে এক্স-রে টিউব, অসিলোস্কোপ নামক যন্ত্র। এক্স-রে টিউবের ব্যবহার রঞ্জন রশ্মি উৎপাদনের কাজে। আর ক্যাথোড-রে অসিলোস্কোপ দিয়ে কোন অজানা বৈদ্যুতিক তরঙ্গের কম্পাংক, বিস্তার, সময় ইত্যাদি নির্ণয় করা যায়।

banglainternet.com

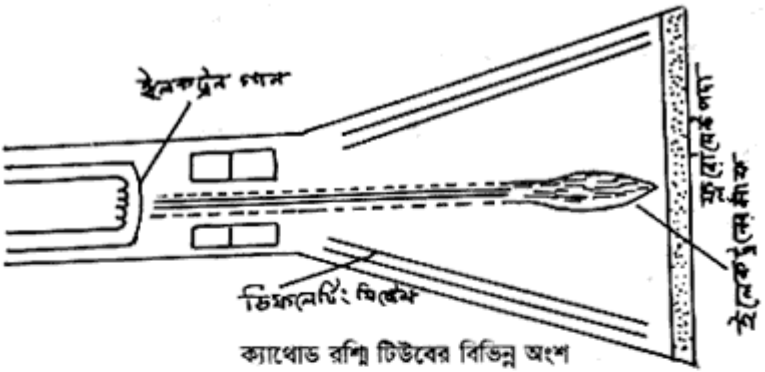

ক্যাথোড রশ্মি টিউবের বিভিন্ন অংশ

পদার্থের রূপান্তর ও তেজস্ক্রিয় ক্ষয়

এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে শুধু শক্তিরই রাজত্ব। শক্তির রূপান্তর আছে। কিন্তু ধ্বংস নেই। বিশেষ উপায়ে এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায় পরিবর্তিত হয় মাত্র। বৈদ্যুতিক বাল্বে আলো জ্বলে। বিদ্যুৎ শক্তি পরিণত হয় আলোক শক্তিতে। উত্তপ্ত বাল্ব তাপ ছড়ায়। এতে উৎপন্ন হয় তাপশক্তি। তাপে কাঠ-কয়লা পুড়ে ছাই হয়। পানি পরিণত হয় বাষ্পে। সে বাষ্পের চাপে ইঞ্জিনের চাকা ঘোরে। তাপ শক্তির প্রভাবে স্থিতিশক্তি পরিবর্তিত হলো গতি শক্তিতে। এভাবে হামেশাই শক্তির অবস্থার বদল ঘটছে।

তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলোও অদ্রুপ তেজস্ক্রিয় বিকিরণ করতে করতে ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। আর তাতে তৈরি হচ্ছে নবসৃষ্ট মৌল। আগেই বলা হয়েছে, প্রকৃতিতে প্রাপ্ত মোট মৌল বিরানব্বইটি। ৯৩-তম হতে ১০৫-তমটি কৃত্রিমভাবে তৈরি। মৌল তালিকায় বিরাশিতম সদস্যটি হচ্ছে লেড বা সীসা। এর পরবর্তী সবকটি মৌলই তেজস্ক্রিয় ক্ষয় প্রক্রিয়ায় ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে সীসার জন্ম দিচ্ছে। একে বলে "তেজস্ক্রিয় ক্ষয়" বা রেডিও একটিভ ডিকে।

এতে তিন ধরনের তেজ বিকীর্ণ হয়। সেগুলো–আলফা, বিটা ও গামা রশ্মি। এরা সবাই জীবকোষের জন্য কম-বেশি ক্ষতিকর।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় রেডিয়াম ধাতুর কথা। এর পারমাণবিক সংখ্যা ৮৮। আর ভর সংখ্যা ২২৬। এটা আলফা রশ্মি বিকিরণ করতে করতে রেডন ও হিলিয়াম হয়। রেডিয়ামের অর্ধজীবন নিঃশেষ হয় ১৬২২ বছর সময়ে।

banglainternet.com

$$[১] \quad {}^{226}_{88}Ra \longrightarrow {}^{222}_{86}Rn + {}^{4}_{2}He$$

রেডিয়াম → রেডন + হিলিয়াম

তদ্রুপ বলা যায়, ফসফরাস একটা প্রোটন সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে সালফার হয়। আবার নাইট্রোজেন একটা প্রোটন হারিয়ে কার্বন হয়।

[২] $^{৩২}_{১৫}P \longrightarrow {}^{৩২}_{১৬}S$ + বিটা মাইনাস + নিউট্রিনো।

ফসফরাস → সালফার

[৩] $^{১২}_{৭}N \longrightarrow {}^{১২}_{৬}C$ + বিটাপ্লাস + নিউট্রিনো

নাইট্রোজেন → কার্বন

এক্স-রে এক অদৃশ্য শক্তি

এক্স-রে এক ধরনের অদৃশ্য শক্তি। দৃষ্টির অগোচরে এটা বায়ুমণ্ডল কিংবা পদার্থের ভেতর দিয়ে ছুটে চলে। রঞ্জন রশ্মি অনুভূতিহীন এক বিশেষ শক্তির ঢেউ। এটা দেহে ঢুকলে তাৎক্ষণিকভাবে কিছু বুঝা যায় না। এর চলার পথে তড়িৎ ও চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাব রয়েছে বলে এর আরেক নাম তড়িৎ-চৌম্বকীয় তরঙ্গ। ইংরেজীতে ইলেকট্রো-মেগনেটিক রেডিয়েশন। সংক্ষেপে ই. এম. আর।

রঞ্জন রশ্মি আলোর গতিসম্পন্ন। আলোর গতি প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। অন্যকথায়, ৩ ×১০^{৮} মিটার/সেকেণ্ড। এ অদৃশ্য আলোর কোন ভর নেই। চার্জ নেই। কি ধনাত্মক-কি ঋণাত্মক, কোনটিই নয়। এটা বহু শক্তির সমন্বয়ে তৈরি। শক্তির সীমা পনেরো হতে প্রায় দেড়শ কিলো ইলেকট্রন ভোল্ট।

রঞ্জন রশ্মি ফটোগ্রাফীর ফিল্মেও সুপ্ত ছবি বানাতে পারে। জীবকোষে আনে নানাবিধ পরিবর্তন। জীবকোষের অন্যতম উপাদান পানি। প্রায় ৮০-৯০ শতাংশ। এই পানির সাথেই রয়েছে বিকিরণের বহু ক্রিয়া-বিক্রিয়া। এক্স-রে পানির অণুর সাথে ক্রিয়া করে উৎপন্ন করে কিছু ক্ষতিকারক জিনিস। তাদের মধ্যে রয়েছে ফ্রি অক্সিজেন রেডিক্যাল, হাইড্রোজেন-পার-অক্সাইড, হাইড্রোপারঅক্সিল। এরা সবাই জীবকোষের জন্য ক্ষতিকর।

কোন বস্তুর পরমাণুতে ইলেকট্রন ও প্রোটনের সংখ্যা সমান। এতে বস্তুটি স্থিতিশীল অবস্থায় থাকে। কিন্তু কোন কারণে ইলেকট্রনের সংখ্যা স্বাভাবিকের চেয়ে কম বা বেশি হলেই বস্তুটি অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে। একে বলে 'আয়োনাইজেশন'। এক্স-রে পদার্থের আয়োনাইজেশন ঘটাতে পারে। আবার কম শক্তির রঞ্জন রশ্মি পরমাণুর বহিঃ ইলেকট্রনকে ধাক্কা দিলে ইলেকট্রনটি স্থানচ্যুত হয় না। কিন্তু পরমাণুটি শক্তি সঞ্চয় করে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তারপর এক সময় শক্তি নির্গমণের মাধ্যমে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। এর নাম এক্সসাইটেশন। পরমাণুর বাইরের কক্ষপথ হতে এক একটি ইলেকট্রন সরাতে শক্তি লাগে ৫–৩০ ইলেকট্রন ভোল্ট।

banglainternet.com

এমন অনেক পদার্থ আছে, যেগুলো এক্স-রে শোষণ করার পর আলোক বিকিরণ করে। যেমন–ক্যালসিয়াম ফ্লোরাইড, লিথিয়াম ফ্লোরাইড,সোডিয়াম–আয়োডাইড-একটিভেটেড-সিলভার। পদার্থের এ বৈশিষ্ট্যটির নাম "ফ্লুরিসেন্স"। কিঞ্চিৎ বিলম্বে আলো বিকীর্ণ হলে তার নাম "ফসফোরিসেন্স।"

এক্স-রে আসে কোথা থেকে?

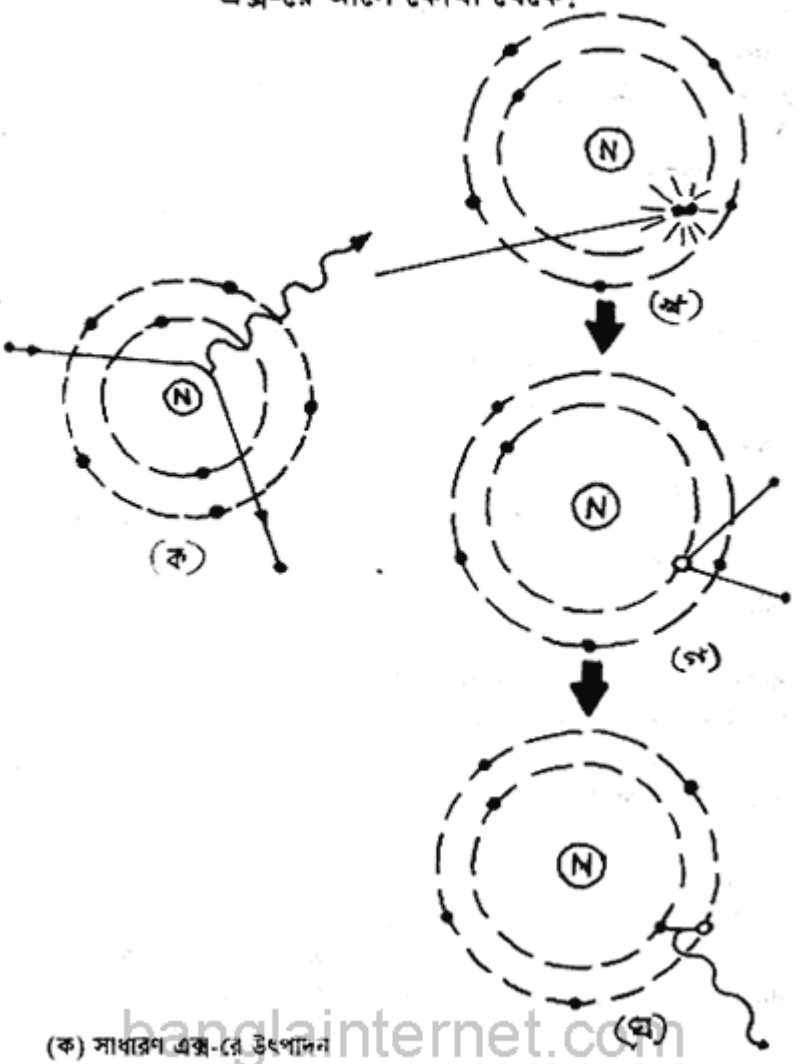

(ক) সাধারণ এক্স-রে উৎপাদন
(খ), (গ), (ঘ)-বিশেষ এক্স-রে উৎপাদন।

banglainternet.com

(খ), (গ), (ঘ)

ধরা যাক, একজন লোক খুব বেগে দৌড়াচ্ছেন। তাঁর গতিবেগ ঘন্টায় ত্রিশ কিলোমিটার। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন পর্যবেক্ষক। তিনি হঠাৎ একখানি দড়ির বেড় দিয়ে ছুটন্ত লোকটির গতি নিয়ন্ত্রণ করলেন। গতিবেগ নেমে এলো দশ কিলোমিটারে। লোকটি শক্তি হারালো বিশ কিলোমিটার/ঘন্টা। এটাই অতিরিক্ত বিকীর্ণ শক্তি। কোন ছুটন্ত ইলেকট্রনের ঝাঁককে নিউক্লিয়ার ক্ষেত্র দ্বারা প্রভাবিত করে তার গতি কমালে যে অতিরিক্ত শক্তি বিকীর্ণ হয়, সেটাই এক্স-রে বা রঞ্জন রশ্মি হিসেবে পরিচিত। উপরের 'ক' চিত্রে বিষয়টি দেখানো হয়েছে। দূরন্ত বেগে ছুটে আসছে একটি ইলেকট্রন। সে নিউক্লিয়াসের আকর্ষণে গতি কমিয়ে অন্য দিকে ছুটে গেল। গতি কমানোর ফলেই ঢেউয়ের আকারে বের হলো এক্স-রে। এর নাম সাধারণ বিকিরণ বা ব্রেমস রেডিয়েশন।

প্রশ্ন জাগে, ইলেকট্রন কোথা থেকে আসে? আমরা লোহিত তপ্ত হিটার হতে তাপশক্তির নির্গমন দেখেছি। বৈদ্যুতিক বাল্ব হতে তাপ ও আলোকের বিচ্ছুরণ দেখছি। আরো দেখেছি, ইনফ্রারেড লাইট হতে অবলোহিত রশ্মির বিকিরণ। ইস্পাত কারখানায় অগ্নিদগ্ধ গলন্ত লোহা চিকন শলাকার আকারে বের হয়ে রডের সৃষ্টি করে। এসবে কি হয়? উত্তপ্ত ইলেকট্রনের ঝাঁক তাপশক্তির আকারে বেরিয়ে আসে।

কোন লোহিত তপ্ত বৈদ্যুতিক ফিলামেন্ট হতে ইলেকট্রনের বিচ্ছুরণকে 'থারমিয়নিক ইমিশন' বলে। আর উত্তপ্ত ইলেকট্রনকে বলে 'থারমিয়ন'। এক্স-রে টিউবে রঞ্জন রশ্মি উৎপাদনে উক্ত প্রক্রিয়া ব্যবহৃত হয়। ফিলামেন্ট সার্কিটে কারেন্ট প্রবাহিত হলে সেটা খুব উত্তপ্ত হয়। সেখান থেকে ইলেকট্রনের ঝাঁক এনোড বা পজেটিভ মেরুর দিকে ধাবিত হয়। এনোডে ধাক্কা খেলে প্রচণ্ড তাপ উৎপন্ন হয় এবং একই সাথে রঞ্জন রশ্মিও বেরিয়ে আসে।

রঞ্জন রশ্মি উৎপাদনের আরেকটি প্রক্রিয়া রয়েছে। সেটা হলো ইলেকট্রন স্থানান্তর পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে খুব কম পরিমাণে রঞ্জন রশ্মি উৎপন্ন হয়। বর্হিইলেকট্রনের ধাক্কায় টার্গেট-এটমের ভেতরের শেল হতে ইলেকট্রন স্থানচ্যুত হয়। ফলে সেখানে একটি গর্তের সৃষ্টি হয়। বাইরের শেল বা কক্ষপথ হতে একটি ইলেকট্রন ভেতরের গর্তে পড়লে কিছু শক্তি এক্স-রে আকারে বেরিয়ে পড়ে। এর নাম বিশেষ বিকিরণ। এটা নির্ভর করে টার্গেট বা এনোডের উপর। এর বিপরীতে সাধারণ বিকিরণ নির্ভর করে কিলোভোল্টের ওপর।

মানব কল্যাণে সাধারণ বিকিরণের প্রয়োগ বেশি। একে হোয়াইট এক্স-রে নামেও ডাকা হয়। এর একটা অবিরাম বর্ণালী রয়েছে। এটা পলি-এনার্জেটিক বা বহু শক্তির সমষ্টি। ৫০ হতে ১০০ কিলোভোল্ট এক্স-রেতে প্রায় ৯৫% সাধারণ বা অবিরাম বিকিরণ উৎপন্ন হয়। এর সাথে টার্গেট ইলিম্যান্ট হতে উৎপন্ন শক্তির তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের কোন সম্পর্ক নেই। মেদময় কলার এক্স-রে মেমোগ্রাফীতে এর কোন ভূমিকা নেই।

banglainternet.com

এক্স-রে ও পদার্থের ক্রিয়া-বিক্রিয়া

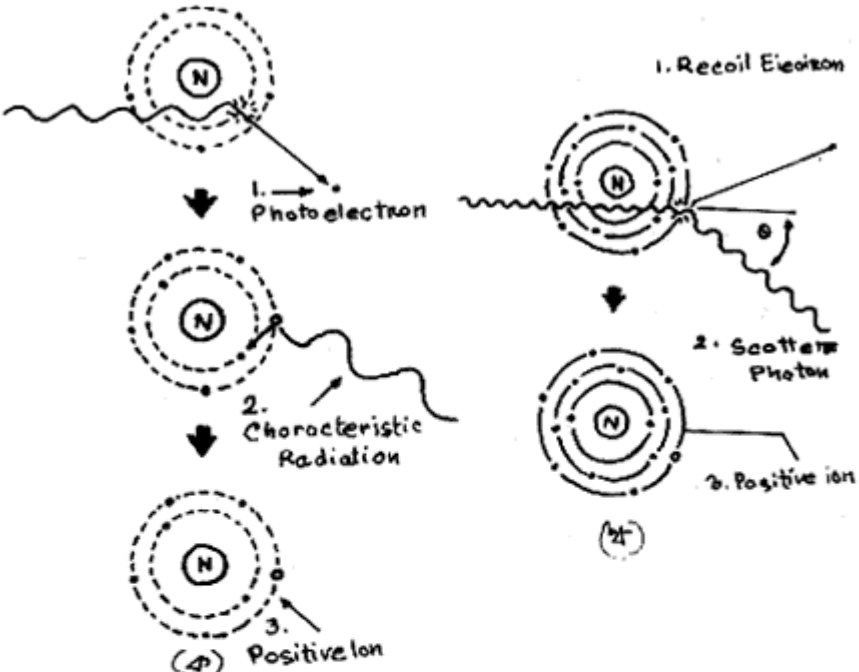

(ক) ফটোইলেকট্রিক ক্রিয়া

(খ) কম্পটন ইফেক্ট

এক্স-রে এক ধরনের শক্তি। পদার্থের সাথে রয়েছে এর বিভিন্ন রকমের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। সেটা নির্ভর করে বিকিরণের শক্তির ওপর। অপেক্ষাকৃত কম শক্তির বিকিরণ রেডিওগ্রাফীতে ব্যবহৃত হয়। খুব উচ্চ শক্তিতে এক্স-রে দিয়ে ছবি তোলা যায় না। তাতে আলোক কণা 'ফোটনের' ধাক্কায় নিউক্লিয়াসটি ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়। নিউক্লিয়াসের ভেতরের কণিকাসমূহ বিদীর্ণ কেন্দ্রিকা ছেড়ে এদিক সেদিক ছিটকে পড়ে। নিউট্রন, প্রোটন, আলফা কণিকা, ডিউটেরন-কারোই কোন স্বাভাবিক অবস্থা থাকে না। এটা খুবই উচ্চশক্তি যেমন– সাত হতে পনেরো মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্টে শুরু হয়। পদার্থ বিজ্ঞানের ভাষায়, একে বলে 'ফটো-ডিসইনটিগ্রেশন'।

খুব কম শক্তির এক্স-রে তেমন ক্ষতিকর নয়। তাতে ফোটনের ধাক্কায় পরমাণুর কক্ষপথ হতে ইলেকট্রন সরে না। তবে ইলেকট্রনটির চারপাশে এক ধরনের তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। আলোক কণা বা ফোটনটি দিক পাল্টিয়ে সরে যায়। এত কম শক্তির এক্সরে দিয়ে ছবি তৈরি হয় না। এতে শক্তি থাকে দশ কেভির কম।

banglainternet.com

এক্স-রে ও পদার্থের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়া হলো 'পেয়ার-প্রোডাকশন'। পেয়ার মানে জোড়া। কমপক্ষে ১.০২ মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্টে এটা শুরু হয়। দশ মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্টে এটা গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে পৌঁছে এবং ২৪ এম.ই.ভি.-তে তীব্রতম হয়। এতে ফোটন বা আলোক কণাটি সরাসরি নিউক্লিয়াসকে ধাক্কা দেয়। ফলে দু'টি ইলেকট্রন উৎপন্ন হয়। একটি পজিট্রন; অন্যটি নিগাট্রন। এ দু'টিকে একত্রে পেয়ার বা জোড়া বলে। পজিট্রনটি অন্য ফ্রি-ইলেকট্রনের সাথে মিলে ধ্বংস হয়ে যে শক্তি দেয়, তা দু'টি আলোক কণার জন্ম দেয়। তাদের শক্তি .৫১১ এম.ই.ভি। তারা পরস্পর বিপরীত দিকে ছুটে চলে।

৭০ হতে ১১০ কিলোভোল্ট শক্তি সম্পন্ন এক্স-রে কণা পদার্থের ওপর পড়লে পরমাণুর বহির্ইলেক্ট্রন সরে যায়। স্থানচ্যুত ইলেকট্রনটিকে 'রিকয়েল-ইলেকট্রন' বলে। সেটা অন্য পরমাণুর সাথে ক্রিয়া করে। আলোক কণাটি দুর্বল শক্তি নিয়ে অন্যদিকে গমন করে। তাকে 'স্ক্যাটার-ইলেকট্রন' বলে। এটা ফিল্মে পড়লে কালো দাগ সৃষ্টি করে। এর নাম 'ফিল্ম-ফগিং'। পুরো বিক্রিয়ার নাম 'কম্পটন-ইফেক্ট'। পদার্থের সাথে নীচু শক্তি অর্থাৎ বিশ হতে সত্তুর কিলো ভোল্টের এক্স-রে ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় ফটো ইলেকট্রন তৈরি হয়। এতে ভাল এক্স-রে প্রতিবিম্ব তৈরি হয়। কোন বিকীর্ণ কণা বা ফোটন যদি পরমাণুর ইলেকট্রনকে ধাক্কা দেয়, তখন কম শক্তির ফোটনটি শোষিত হয়। ফলে গোটা পরমাণু অস্থিতিশীল হয়। শেষে একটি ইলেকট্রনকে ঊর্ধ্বে উৎক্ষেপণ করে। পরিণামে পরমাণুটি উত্তেজিত হয়। বহির্শেল হতে একটি ইলেকট্রন ভেতরের গর্তে পতিত হয়। ধীরে ধীরে পরমাণু শক্তি বিকিরণ করে শান্ত হয়। সেই বিকীর্ণ শক্তিই বিশেষ বিকিরণ হিসেবে পরিচিত। এর নাম 'ফটো-ইলেকট্রিক ইফেক্ট'।

বিদ্যুৎ চলে ঢেউয়ের দোলায়

এক্স-রে উৎপাদনের জন্য প্রথমেই যে জিনিসের দরকার তা হলো বিদ্যুৎ। আমাদের বৈদ্যুতিক লাইনে যে কারেন্ট বা ইলেকট্রিসিটি প্রবাহিত হয় তার চাপ ২২০ ভোল্ট, কম্পাংক ৬০ হার্টজ। স্বভাবে সেটা পরিবর্ত বিদ্যুৎ। ইংরেজীতে অলটারনেটিং কারেন্ট। সংক্ষেপে এ. সি.। এতে বিদ্যুৎ প্রবাহের ঢেউ দিক পাল্টায়। একটা নির্দিষ্ট সময়ে অর্ধ কুলম্ব চার্জ যেদিকে প্রবাহিত হয়, তার পরবর্তী সময়ে ঠিক সে পরিমাণ চার্জ উল্টো দিকে প্রবাহিত হয়। সরাসরি এ.সি. ব্যবহার করে এক্স-রে উৎপাদন করা যায় না। এর পজেটিভ ফেজে এক্স-রে হবে। কিন্তু নেগেটিভ ফেজে হবে না। সেজন্য 'রেকটিফায়ার' ব্যবহার করে এ.সি.-কে ডি.সি. করে নিতে হয়।

ডি.সি. মানে ডায়রেক্ট কারেন্ট। ইহা সমবর্ত বিদ্যুৎ। এটা দিক পাল্টায় না। এতে বিদ্যুৎ প্রবাহ একই দিকে গমন করে। একটা নির্দিষ্ট সময়ে অর্ধকুলম্ব চার্জ যেদিকে গমন করে, তার পরবর্তী সময়ে সে পরিমাণ চার্জ একই দিকে যায়। এতে উভয় ফেজেই কারেন্ট পাওয়া যায়। শক্তিও পাওয়া যায় অনেক বেশি যা এক্স-রে উৎপাদনের জন্য খুবই জরুরী।

banglainternet.com

বিদ্যুৎ প্রবাহ নিয়ে অতীতে বহু বিজ্ঞানী গবেষণা করেছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন জর্জ সাইমন ওহম। এ জার্মান গণিতজ্ঞ ১৭৮৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন আর মৃত্যুবরণ করেন ১৮৫৪ সালে। তিনি বিদ্যুৎ প্রবাহ, বিদ্যুৎ-বিভব ও বৈদ্যুতিক রোধের মধ্যে একটা সম্পর্ক আবিষ্কার করেন। পদার্থ বিজ্ঞানে সেটাই 'ওহমের সূত্র' নামে পরিচিত। সূত্রটি নিম্নরূপ ঃ

নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোন পরিবাহী তারের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত বিদ্যুতের পরিমাণ বৈদ্যুতিক চাপের সমানুপাতিক আর বৈদ্যুতিক বাধা বা রোধের ব্যস্তানুপাতিক। ধরা যাক, বিদ্যুতের পরিমাণ = I, চাপ =V; বৈদ্যুতিক রোধ =R; সুতরাং $I \alpha V$ এবং $I \alpha \frac{1}{R}$। অতএব $I = V/R$।

অর্থাৎ বিদ্যুতের পরিমাণ=বৈদ্যুতিক চাপ ÷ রোধ। বৈদ্যুতিক চাপ বাড়ার সাথে সাথে বিদ্যুতের পরিমাণও বাড়ে। আবার পরিবাহী তারের রোধ বেড়ে গেলে সেটা বিদ্যুৎ প্রবাহকে বাধা দান করে। আর তাতে বিদ্যুতের পরিমাণ কমে। পদার্থ বিজ্ঞানে বৈদ্যুতিক চাপের একক 'ভোল্ট', রোধের একক হলো 'ওহম'। আর কারেন্ট বা বিদ্যুতের পরিমাণের একক 'এম্পিয়ার'। পদার্থবিদ আঁদ্রে এম্পিয়ারের নামানুসারে এ নাম রাখা হয়েছে।

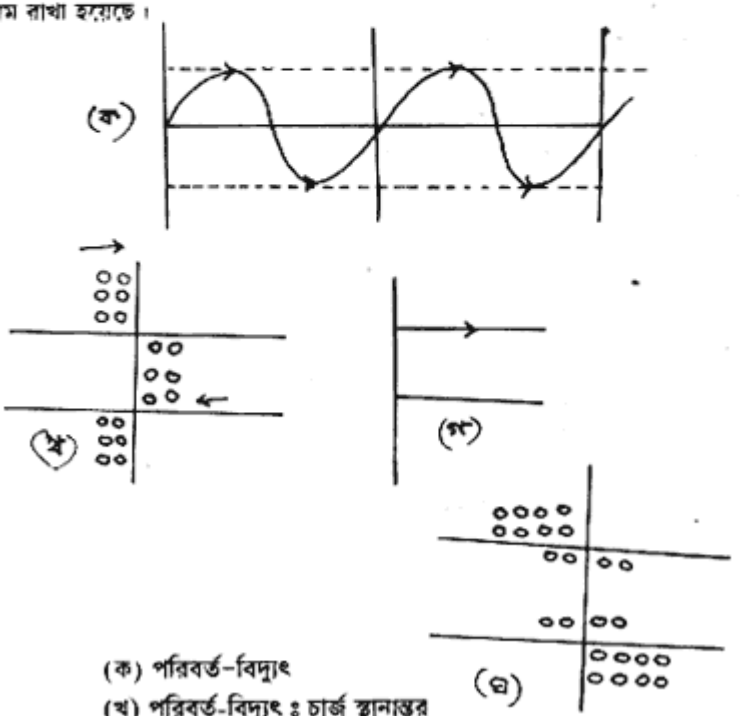

(ক) পরিবর্ত-বিদ্যুৎ
(খ) পরিবর্ত-বিদ্যুৎ ঃ চার্জ স্থানান্তর
(গ) সমবর্ত-বিদ্যুৎ
(ঘ) সমবর্ত বিদ্যুৎ; চার্জ স্থানান্তর

banglainternet.com

এক্স-রে টিউব একটি বায়ুশূন্য কাঁচনল

রঞ্জন রশ্মি উৎপন্ন হয় এক্স-রে টিউব হতে। এটি একটি বায়ুশূন্য কাঁচনল। এর মাঝখানের অংশ ফাঁপা। দু-প্রান্ত কিঞ্চিৎ চিকন। পজেটিভ ও নেগেটিভ মেরু দু'টিকে টিউবের দু'প্রান্তে সেট করা হয়। কাঁচনলটি বায়ুশূন্য হওয়াতে সুবিধা অনেক। বায়ুশূন্য না হলে ইলেকট্রনের ঝাঁক বায়ু বা গ্যাসের অণুর সাথে সংঘর্ষ করে শক্তি হারাতে পারে। অন্যদিকে কাঁচনল দুর্বল এক্স-রে শোষণ করে প্রাইমারী ফিল্টার হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। টিউবের ভেতরে চাপ থাকে $১০^{-৬}$ মিলিমিটার।

যে তারের মাধ্যমে এক্স-রে টিউবে বৈদ্যুতিক সংযোগ দেয়া হয়, তা শক-প্রুফ হতে হয়। তারের বাইরের দিকে ধাতব প্রলেপ দেয়া থাকে। এটা বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ ভাবে তৈরি। এক্স-রে উৎপাদনের সময় অতিরিক্ত তাপ উৎপন্ন হয়। সেটা শোষণ করার জন্য কুলিং সিস্টেম বা শীতলীকরণ প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। বাইরের ধাতব খোলস ও কাঁচনলের মাঝখানে তেল বা গ্যাস যেমন—সালফার হেক্সাক্লোরাইড ব্যবহার করা হয়। এটা অতিরিক্ত তাপ শোষণ করে।

এক্স-রে টিউবটির চারদিকে একটি শক্ত ধাতব খোলস থাকে। সেটা সীসা ও প্লাষ্টিক অথবা সীসা ও পোরসেলিন দিয়ে তৈরি। এর নাম 'টিউব হাউজিং'। এক বিশেষ উপায়ে ইহা মাটির সাথে সংযুক্ত থাকে। ফলে বৈদ্যুতিক শকের আর সম্ভাবনা থাকে না। অন্যদিকে এটা টিউব হতে লিকেজ বিকিরণ শোষণ করে।

টিউবটির এক প্রান্তে থাকে ধনাত্মক মেরু বা এনোড। অন্যপ্রান্তে থাকে ঋণাত্মক মেরু বা ক্যাথোড। ক্যাথোডের প্রধান অংশ দুটি—১. টাংষ্টেন ফিলামেন্ট, ও ২. ফোকাসিং কাপ। টাংষ্টেন একটি বিশেষ রকমের ধাতু। এর গলনাংক খুব উঁচু, প্রায় ৩৩৭০ ডিগ্রী সেলসিয়াস। তাই উচ্চ তাপে এটা গলে না। ফোকাসিং কাপের কাজ হলো ইলেকট্রন প্রবাহকে ফোকাস করে পজেটিভ মেরু বা এনোডের দিকে প্রেরণ করা। ফিলামেন্ট কয়েল পেঁচানো তার দিয়ে তৈরি। সেটাও টাংষ্টেন ধাতু হতে প্রস্তুত করা হয়। এর দৈর্ঘ্য প্রায় এক সেন্টিমিটার; প্রস্থচ্ছেদ ০.২ মিলিমিটার।

ফিলামেন্ট কয়েল দু'ধরনের—চিকন ও মোটা। চিকন বা ফাইন ফিলামেন্টের সাহায্যে ছোট্ট জায়গায় ইলেকট্রন ফোকাস করা যায়। তাতে ভাল ছবি তৈরি হয়। মোটা বা কোর্স ফিলামেন্টের সাহায্যে বড় জায়গায় ইলেকট্রন ফোকাস করা হয়। ফিলামেন্টে ১০ ভোল্ট বিদ্যুৎ-চাপের জন্য ৬ এম্পিয়ার কারেন্ট পাওয়া যায়।

ধনাত্মক বা পজেটিভ মেরু ও টাংষ্টেন ধাতুর তৈরি। এর আরেক নাম এনোড। টাংষ্টেন ব্যবহারের তিনটি সুবিধে। এক. এর আণবিক সংখ্যা ৭৪। দুই. এর গলনাংক ৩৩৭০ ডিগ্রী সেলসিয়াস। তিন. টাংষ্টেনের তাপ পরিবহন ক্ষমতাও খুব ভাল। এক

banglainternet.com

টুকরো তামার উপর টাংস্টেন-টার্গেট বসানো থাকে। টার্গেট হলো সে জায়গা যেখানে ইলেকট্রন-বীম আঘাত হানে। টাংস্টেনে তৈরি অতিরিক্ত তাপ তামার মাধ্যমে অন্যত্র পরিবাহিত হয়।

ফোকাসে ছোট্ট একটি কোণ থাকে। তার নাম এনোড-এংগেল। এর মান ১৬-২০ ডিগ্রী। আর এক্স-রে থেরাপী মেশিনে ২৬ হতে ৩২ ডিগ্রী। রোগ নির্ণায়ক এক্স-রে মেশিনে এনোড দু'ভাবে সেট করা থাকেঃ স্থির ও ঘূর্ণায়মান। ঘূর্ণায়মান এনোডে উচ্চ কারেন্ট ২০০-৫০০ মিলি এম্পিয়ার সরবরাহ করলে যে তাপ উৎপন্ন হয়, তা ঘূর্ণনের ফলে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ঘূর্ণনের গতি প্রতি মিনিটে ৩৩০০ হতে ৮৫০০। ঘূর্ণায়মান এনোড মলিবডেনাম ডিস্ক দিয়ে তৈরি, যার উপর টাংস্টেন ও রেনিয়াম ধাতু বসানো থাকে।

এনোড ও ক্যাথোডের মধ্যে উচ্চ বৈদ্যুতিক চাপের পার্থক্যের কারণে ক্যাথোড হতে উৎপন্ন ইলেকট্রনের ঝাঁক সবেগে এনোডের দিকে ধাবিত হয়। রোগ নির্ণায়ক এক্স-রে মেশিনে এটা ৪০ হতে ১৫০ পিক কিলো-ভোল্ট পর্যন্ত হয়। কিন্তু মাত্র দশ ভোল্টেই ফিলামেন্ট কয়েল হতে ইলেক্ট্রনের বিচ্ছুরণ ঘটে। এক্স-রে থেরাপী মেশিনে প্রায় ৪০০ কেভিপির ওপর পর্যন্তও ভোল্টেজ ওঠে। একটা ষ্টেপ-আপ অটো ট্রান্সফর্মারের মাধ্যমে এটা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। অতএব জানা গেল: এক্স-রে টিউবের প্রধান অংশ ছয়টি। ১. এনোড, ২. ক্যাথোড, ৩. উচ্চ ভোল্টেজ, ৪. বায়ুশূন্য কাঁচনল, ৫. টিউব হাউজিং ও ৬. কুলিং সিস্টেম।

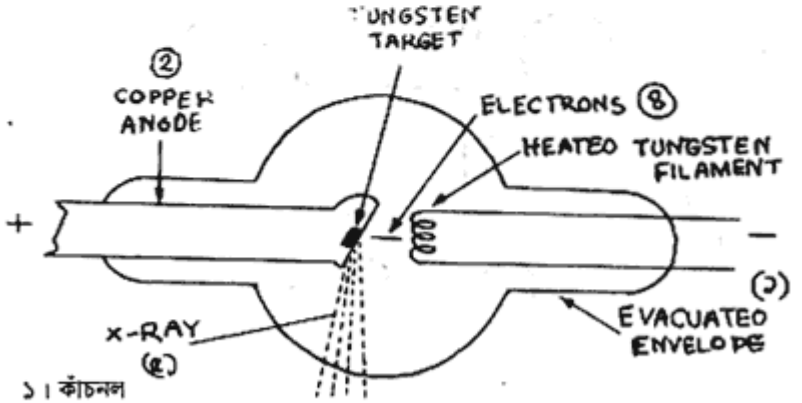

১। কাঁচনল
২। এনোড
৩। ক্যাথোড
৪। ইলেক্ট্রন প্রবাহ
৫। রঞ্জন রশ্মি

banglainternet.com

এক্স-রে টিউবের বিভিন্ন অংশ

এক্স-রে জেনারেটর ঃ শক্তির উৎস

এক্স-রে জেনারেটর টিউবে প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করে। একটা এক্স-রে জেনারেটর ১২০ বা ২২০ ভোল্ট, ৬০ হার্টজ এ.সি. কারেন্ট নিয়ে কাজ শুরু করে। তারপর এ শক্তিকে টিউবের প্রয়োজনীয় শক্তিতে রূপান্তরিত করে। টিউবে বৈদ্যুতিক শক্তি দু'কারণে দরকার। এক. ফিলামেন্ট কয়েল হতে ইলেকট্রন পৃথককরণের জন্য। দুই. ক্যাথোড হতে এনোডের দিকে ইলেকট্রন ধাবিত করণের জন্য। এ দু'টি কাজের জন্য জেনারেটরে দু'টি পৃথক সার্কিট থাকে। একটি 'ফিলামেন্ট সার্কিট" অন্যটি 'হাই-ভোল্টেজ সার্কিট'। জেনারেটরে আরেক ধরনের সার্কিট থাকে। তাকে টাইমিং সার্কিট বলে। এটা এক্সপোজার টাইম নিয়ন্ত্রণ করে।

দু'টি পৃথক প্রকোষ্ঠের মাধ্যমে জেনারেটরের যাবতীয় সব কার্যাবলী নিয়ন্ত্রিত। সেগুলো—কন্ট্রোল প্যানেল ও ট্রান্সফর্মার এসেম্বী।

কন্ট্রোল প্যানেলে একটা মেইন সুইচ, তিনটা সিলেকটর বোতাম, দু'টি মিটার ও দু'টি এক্সপোজার বোতাম থাকে। কন্ট্রোল প্যানেলের সাহায্যে রেডিওগ্রাফার সঠিকভাবে কেভিপি, এম.এ., ও এক্সপোজার টাইম নির্বাচন করতে পারেন। একটা এক্সপোজার বাটন এক্স-রে টিউবের ফিলামেন্ট সার্কিটকে উত্তপ্ত করে ইলেকট্রন উৎপন্ন করে এবং এনোডকে ঘূর্ণায়মান করে। অন্যটা এক্সপোজার দেয়া শুরু করে।

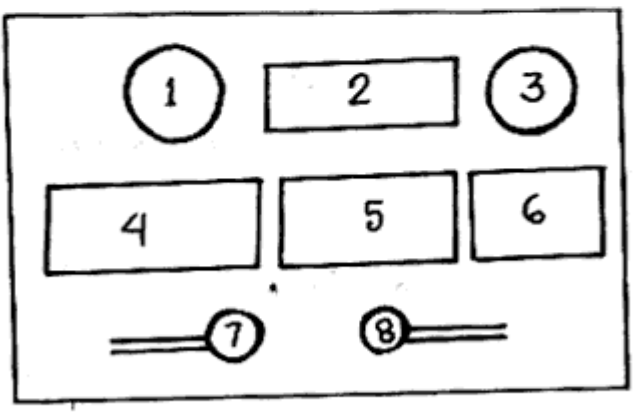

এক্সরে কন্ট্রোল প্যানেল

১। এম.এ. মিটার
২। অন-অফ সুইচ
৩। কেভিপি
৪। এম. এ. সিলেক্টর
৫। টাইম সিলেকটর
৬। কেভিপি সিলেকটর
৭। এক্সপোজার বাটন
৮। স্ট্যান্ডবাই বাটন

banglainternet.com

এক্স-রে ট্র্যান্সফর্মার ঃ শক্তি বাড়ায়–কমায়

ট্র্যান্সফর্মার এক ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইচ। এটা সার্কিট বা বৈদ্যুতিক বর্তনীতে বৈদ্যুতিক চাপ বা ভোল্টেজ বাড়াতে-কমাতে পারে। যে ট্র্যান্সফর্মার ভোল্টেজ বাড়ায়, তার নাম 'ষ্টেপ-আপ ট্র্যান্সফর্মার'। আর যেটা কমায়, সেটা 'ষ্টেপ-ডাউন ট্র্যান্সফর্মার'। এক্স-রে জেনারেটর গ্রহণ করে ১২০ বা ২২০ ভোল্ট, ৬০ হার্টজ এ.সি. কারেন্ট। ফিলামেন্ট কয়েল গরম হওয়ার জন্য দরকার ১০ ভোল্টের। অন্যদিকে ইলেকট্রন প্রবাহের গতি বৃদ্ধির জন্য দরকার চল্লিশ হাজার থেকে দেড় লক্ষ ভোল্ট বৈদ্যুতিক চাপের। সেজন্য ফিলামেন্ট সার্কিটের জন্য ব্যবহৃত হয় লো-ভোল্টেজ 'ষ্টেপ-ডাউন ট্র্যান্সফর্মার।' আর হাই-ভোল্টেজ সার্কিটের জন্য 'ষ্টেপ-আপ ট্র্যান্সফর্মার'।

উচ্চ বৈদ্যুতিক চাপের কারণে তাপও উৎপন্ন হয় বেশি। সেজন্য ট্র্যান্সফর্মার ও রেকটিফায়ারসমূহ তেলে নিমজ্জিত থাকে। তেল ইনসুলেটর বা বিদ্যুৎ নিরোধক উপাদান হিসেবে কাজ করে এবং বিভিন্ন অংশের মধ্যে স্পার্কিং বন্ধ করে।

ট্র্যান্সফর্মারে দু'টি কয়েল থাকে-প্রাইমারী ও সেকেণ্ডারী। একখানা আয়রন রিঙের দু'পাশে তার পেঁচানো থাকে। প্রথমটির নাম প্রাইমারী কয়েল। আর পরবর্তীটির নাম সেকেণ্ডারী কয়েল। প্রাইমারী কয়েলের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হওয়ার ফলে আয়রন রিঙের চারদিকে একটা চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। তাতে সেকেণ্ডারী কয়েলেও বিদ্যুৎ প্রবাহ সৃষ্টি হয়। যখন চৌম্বক ক্ষেত্র পরিবর্তিত হতে থাকে, কেবলমাত্র তখনি বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। চৌম্বক ক্ষেত্র স্থির থাকলে কারেন্ট প্রবাহিত হয় না।

ভোল্টেজ পজেটিভ হলে কারেন্ট এক দিকে যায়। নেগেটিভ হলে যায় উল্টো দিকে। পরিবর্ত বিদ্যুতের বৈশিষ্ট্য হলো, এর বৈদ্যুতিক চাপ সব সময় ওঠা-নামা করে। ফলে চৌম্বক ক্ষেত্রও সার্বক্ষণিক পরিবর্তিত হতে থাকে। ষ্টেপ-আপ ট্র্যান্সফর্মার ভোল্টেজ বাড়ায়; কিন্তু কারেন্ট কমায়। এর উল্টোটা ঘটে ষ্টেপ-ডাউন ট্র্যান্সফর্মারে।

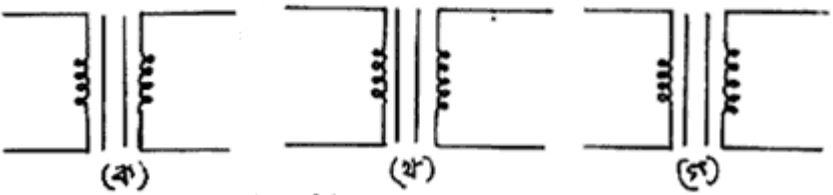

(ক) ট্র্যান্সফর্মার সার্কিট।
(খ) ষ্টেপ-আপ ট্র্যান্সফর্মার (পরের কয়েলে পেঁচ বেশি)
(গ) ষ্টেপ-ডাউন ট্র্যান্সফর্মার (পরের কয়েলে পেঁচ কম)

banglainternet.com

এক্স-রে অটোট্র্যান্সফর্মার

এটা স্বাভাবিক ট্র্যান্সফর্মারের উন্নততর অবস্থা। এতে একটি মাত্র কয়েল ব্যবহৃত হয়। সেটা প্রাইমারী ও সেকেণ্ডারী–উভয় কয়েল হিসেবেই কাজ করে। অটোট্র্যান্সফর্মার দামে সস্তা। ভোল্টেজের ওঠা-নামাও ভাল নিয়ন্ত্রণ করে।

এক্স-রে মেশিনে অটোট্র্যান্সফর্মার কেভি (কিলোভোল্ট) সিলেক্টর হিসেবে কাজ করে। এতে একটি মাত্র কয়েল থাকায় কম তামার প্রয়োজন হয়। তাই এটার খরচ পড়ে কম। অটোট্র্যান্সফর্মার দু'ধরনেরঃ ষ্টেপ-আপ ও ষ্টেপ-ডাউন।

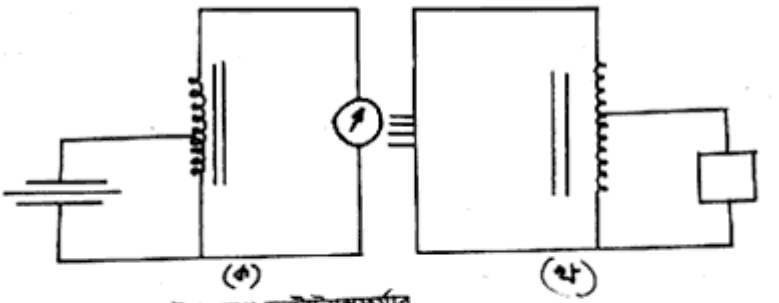

(ক) ষ্টেপ-আপ অটোট্র্যান্সফর্মার

(খ) ষ্টেপ-ডাউন অটোট্র্যান্সফর্মার

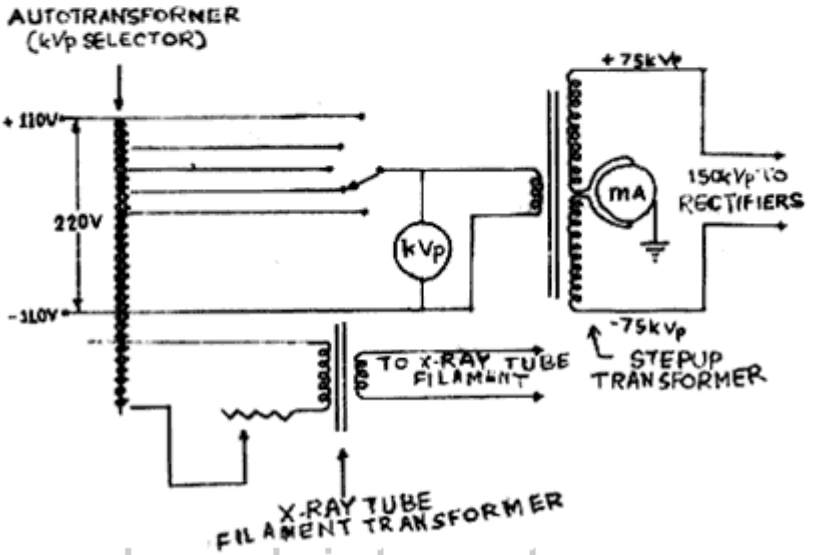

banglainternet.com

হাইভোল্টেজ (ক্যাথোড-এনোড) সার্কিট এবং এক্স-রে টিউব ফিলামেন্ট সার্কিট।

এক্স-রে সার্কিট

বিদ্যুৎ কখনো এলোমেলো দৌড়াতে পারে না। এর চলার জন্য একটা সুনির্দিষ্ট বদ্ধ পথের দরকার। বিদ্যুৎ প্রবাহের সে বদ্ধ পথকে ইলেকট্রিক সার্কিট বা বৈদ্যুতিক বর্তনী বলে। সার্কিট দুধরনের—১. সিরিজ সার্কিট ও ২. প্যারালাল সার্কিট।

সিরিজ সার্কিট সরল বর্তনী। এতে রেসিসটর বা রোধকসমূহ একে অন্যের প্রান্তসীমায় যুক্ত থাকে। ধরা যাক, দু'টি রোধক R_1 এবং R_2। তারা পরস্পর সিরিজ সংযোগে রয়েছে। এমতাবস্থায় তাদের মোট বৈদ্যুতিক রোধ উভয়ের যোগফলের সমান। অর্থাৎ মোট রোধক $R = R_1 + R_2$।

সমান্তরাল বর্তনীর ব্যাপারটি কিন্তু অন্য রকম। নাম শুনেই বুঝা যায়, সেখানে রোধকসমূহ সংযুক্ত হবে সমান্তরালে, প্রান্তসীমায় নয়। দু'টি রোধক R_1 এবং R_2 সমান্তরাল বর্তনীতে সংযুক্ত হলে মোট রোধের মান কমে যায়। সেক্ষেত্রে $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$

পূর্বেই বলা হয়েছে, এক্স-রে টিউবে দু'টো সার্কিট থাকে। একটা—ফিলামেন্ট সার্কিট। অন্যটা—হাই ভোল্টেজ সার্কিট। ষ্টেপ-ডাউন ট্র্যান্সফর্মার এক্স-রে এক্সপোজারের জন্য মিলি-এম্পিয়ার সিলেক্টর। এটা ফিলামেন্টে বিদ্যুৎ প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে। বৈদ্যুতিক রোধ কমালে বাড়ে বিদ্যুতের পরিমাণ। এতে ফিলামেন্টের তাপমাত্রা বাড়ে। একখানা বেশি উত্তপ্ত ফিলামেন্ট বেশি পরিমাণ ইলেক্ট্রন নির্গমন ঘটায়। টিউবের বিদ্যুৎ-বিভব সব ইলেক্ট্রনকে এনোডে ধাবিত করে। সামান্য কিছু ইলেকট্রন মেঘপুঞ্জের মতো টিউবের কোথাও জড়ো হয়ে থাকে। তার নাম 'ইলেকট্রন-ক্লাউড'।

হাই-ভোল্টেজ সার্কিটে দু'টো মিটার সংযুক্ত থাকে। একটা কেভিপি বা পিক কিলো ভোল্ট; অন্যটা এম.এ. ((মিলি এম্পিয়ার)। সার্কিটটি খোলা ও বন্ধের জন্য একটা সুইচ থাকে। আমরা জানি, হাই ভোল্টেজ সার্কিটে ভোল্টেজ থাকে প্রায় পঞ্চাশ হাজার থেকে দেড় লক্ষ ভোল্ট। সেটা নিয়ন্ত্রণ করে ষ্টেপ-আপ ট্র্যান্সফর্মার সেখানে সেকেন্ডারী কয়েলে পেঁচের সংখ্যা প্রাইমারী কয়েল হতে অনেক বেশি।

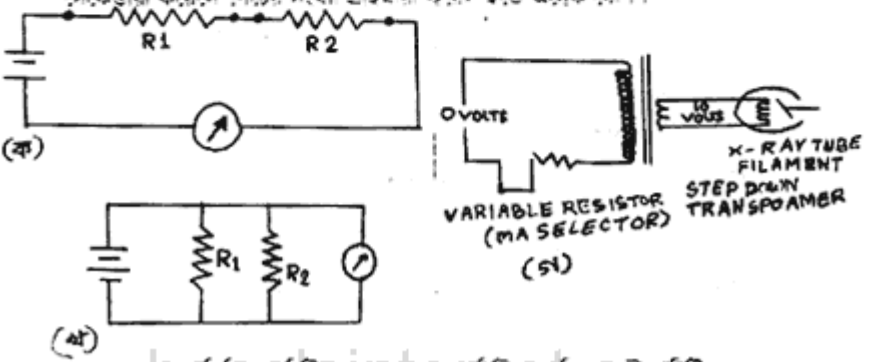

(ক) সিরিজ সার্কিট (খ) প্যারালাল সার্কিট (গ) ফিলামেন্ট সার্কিট

banglainternet.com

ওহম-ভোল্ট-এম্পিয়ার ঃ নিত্যদিন ব্যবহার

ওহম, ভোল্ট, এম্পিয়ার—শব্দগুলোর সাথে আমরা সকলেই কম-বেশি পরিচিত। রাস্তাঘাটে চলার সময় বৈদ্যুতিক ট্র্যান্সফর্মারের গায়ে লেখা থাকে—সাবধান! ২২০ ভোল্ট। কিংবা ৪৪০ ভোল্ট। বৈদ্যুতিক বাল্বের গায়ে লেখা রয়েছে—৪০ ওয়াট, ৬০ ওয়াট কিংবা ১০০। এসবই বিদ্যুতের বিভিন্ন রকমের একক। অম্বর এক প্রকারের রঞ্জন। গ্রীক ভাষায় একে বলে ইলেক্ট্রন। এই ইলেক্ট্রন শব্দটি হতেই 'ইলেকট্রিসিটি' বা বিদ্যুৎ শব্দটি এসেছে। ইলেকট্রিসিটি আর কিছুই নয়, ইলেকট্রনের প্রবাহ মাত্র।

ইলেক্ট্রনের সংখ্যা দিয়ে বৈদ্যুতিক চার্জ বা আধানের পরিমাপ করা যায়। বৈদ্যুতিক চার্জ ধারণ ক্ষমতার একক হলো কুলম্ব। এক কুলম্ব চার্জ ৬.২৫×১০^{১৮} ইলেকট্রনের সমান।

ইতিপূর্বে আমরা ওহমের সূত্র পড়েছি। তাতে বিদ্যুতের পরিমাণ, রোধ এবং বিদ্যুৎ বিভবের একটি সুন্দর সম্পর্কের কথা বর্ণিত হয়েছে। বিদ্যুৎ পরিমাপের একক এম্পিয়ার। পদার্থ বিজ্ঞানী আঁদ্রেই এম্পিয়ারের নাম হতেই শব্দটি এসেছে। একক সময় এক ভোল্ট বৈদ্যুতিক চাপের জন্য এক কুলম্ব চার্জ সরাতে যে পরিমাণ বিদ্যুতের দরকার, তাকে এক এম্পিয়ার কারেন্ট বলে। এর হাজার ভাগের এক ভাগকে বলে মিলি এম্পিয়ার বা সংক্ষেপে mA । এই এম.এ. নির্ধারণ করে এক্স-রে মেশিন তৈরি করা হয়। বিভিন্ন শক্তির এক্স-রে মেশিন রয়েছে, যেমন—১০, ৩০, ৫০, ১০০, ৩০০, ৫০০ এম.এ. ইত্যাদি। এম.এ. বাড়লে রঞ্জন রশ্মির উৎপাদনও বাড়ে।

বৈদ্যুতিক রোধের একক ওহম। এক ভোল্ট বৈদ্যুতিক চাপের পার্থক্যের জন্য এক এম্পিয়ার কারেন্ট প্রবাহিত হতে যে পরিমাণ বৈদ্যুতিক রোধ অতিক্রম করতে হয়, তাকে এক ওহম বলে। মোটা তারের রেসিসট্যান্স বা রোধ কম। চিকন তারের রোধ বেশি। ভোল্ট বৈদ্যুতিক চাপের পার্থক্যের একক। এক কুলম্ব চার্জ অপসারণে যে পরিমাণ বৈদ্যুতিক চাপের পার্থক্যের দরকার, সেটাই এক ভোল্ট। এক ভোল্টের এক হাজার গুণকে বলে এক কিলো-ভোল্ট। কিলো-ভোল্ট বাড়ার সাথে এক্স-রে উৎপাদনও বাড়ে। এক্সরে উৎপাদনে ত্রিশ হতে ১৫০ কিলো-ভোল্ট ব্যবহার করা হয়।

কাজ করার সামর্থকে শক্তি বলে। শক্তির একক ওয়াট। এক সেকেণ্ডে এক ভোল্ট বিদ্যুৎ চাপের জন্য এক এম্পিয়ার কারেন্ট প্রবাহে ব্যবহৃত শক্তিকে এক ওয়াট বলে। আমরা জানি, পাওয়ার = ভোল্ট × এম্পিয়ার।

এক ওয়াট = এক ভোল্ট × এক এম্পিয়ার।

banglainternet.com

এক্স-রে রেকটিফায়ার ঃ একান্ত প্রয়োজনে ব্যবহার

রেকটিফায়ার এক ধরনের ইলেকট্রনিক অংশ। এটা শক্তি উৎপন্ন করতে পারে না। কিন্তু বিদ্যুৎ প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ বা তার দিক পাল্টাতে পারে। কোন ইলেকট্রনিক যন্ত্র এ.সি, বা পরিবর্ত বিদ্যুতে চলে না। রেকটিফায়ার ব্যবহার করে তাকে ডি.সি. বা সমবর্ত বিদ্যুতে পরিণত করে যন্ত্রে ব্যবহার করা হয়। এ পদ্ধতির নাম 'রেকটিফিকেশন'।

যখন ক্যাথোড নেগেটিভ এবং এনোড পজেটিভ হিসেবে কাজ করে, তখন ইলেকট্রন প্রবাহের ফলে এক্স-রে উৎপন্ন হয়। বৈদ্যুতিক চক্রের দ্বিতীয় অর্ধেকে টার্গেট নেগেটিভ আর ফিলামেন্ট পজেটিভ হিসেবে কাজ করে। তখন ইলেকট্রনের ঝাঁক উল্টোদিকে প্রবাহিত হয়। ফলে টার্গেটে কোন ইলেকট্রন থাকে না। বৈদ্যুতিক চক্রের দ্বিতীয় অর্ধেক কারেন্ট প্রবাহ বন্ধ করে এক্স-রে টিউব এ.সি.-কে ডি.সি. করতে পারে। সেজন্য একে রেকটিফায়ারও বলে। যেহেতু বৈদ্যুতিক ঢেউয়ের অর্ধেকটা এক্স-রে উৎপাদনের কাজে লাগে, সেহেতু একে হাফ-ওয়েভ রেকটিফিকেশন বলে। যখন এক্স-রে টিউব নিজেই রেকটিফায়ার হিসেবে কাজ করে, তার নাম 'সেলফ রেকটিফাইড'।

এর অসুবিধে দু'টি। এক. বৈদ্যুতিক চক্রের মাত্র অর্ধেকটা ঢেউ এক্স-রে উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়। সেজন্য ছবি তুলতে এক্সপোজার সময় দ্বিগুণ করতে হয়। দুই. প্রলম্বিত এক্সপোজারের কারণে এনোড উত্তপ্ত হতে পারে। এতে দ্বিতীয় অর্ধচক্রে ইলেকট্রন ফিলামেন্টে আঘাত হেনে তাকে ধ্বংস করতে পারে।

রেকটিফায়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয় ডায়ওড। এটা অর্ধপরিবাহী পদার্থ যেমন– সিলিকন, জার্মেনিয়াম ইত্যাদি দিয়ে তৈরি। ডায়ওডের আরেক নাম ডাই-ইলেকট্রিক। এর দু'টি মেরু থাকে—পজেটিভ ও নেগেটিভ। এক পথে কারেন্ট ঢোকে, অন্য পথে বের হয়। ডায়ওড দু'ধরনের—ক. সেমিকনডাক্টর ডায়ওড, ও খ. ভাল্ব ডায়ওড। ডায়ওড এ.সি.-কে ডি.সি. করে। একটা ডায়ওড ব্যবহার করলে তার নাম 'হাফ ওয়েভ রেকটিফিকেশন'। দু'টো বা চারটা ডায়ওড ব্যবহারে যে শক্তিশালী সমবর্ত—বিদ্যুৎ পাওয়া যায়, তার নাম "ফুল-ওয়েভ রেকটিফিকেশন"। বর্তমানে সব ধরনের এক্স-রে মেশিনে ফুল-ওয়েভ রেকটিফিকেশন ব্যবহার করা হয়। এতে বৈদ্যুতিক শক্তি পুরোপুরি কাজে লাগে। চার ডায়ওড ব্যবহার করলে তার নাম 'ব্রীজ-রেকটিফায়ার'।

banglainternet.com

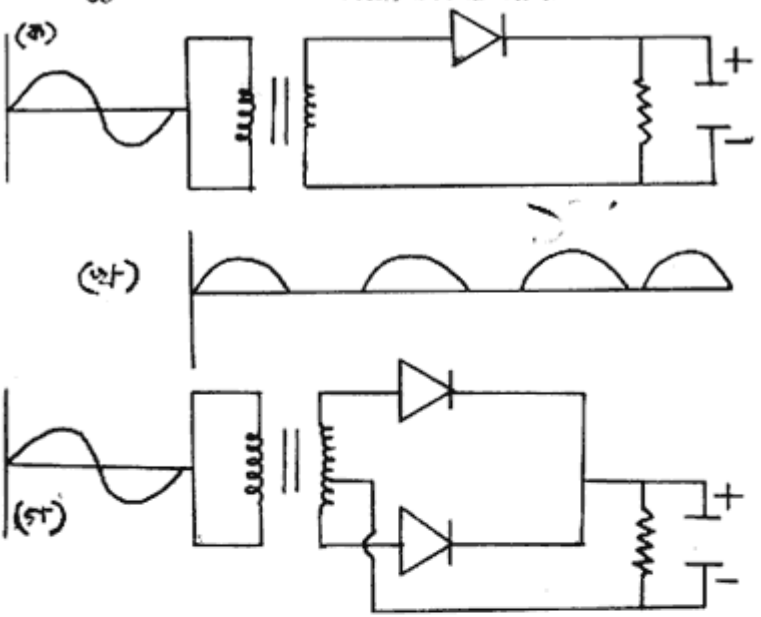

(ক) হাফ-ওয়েভ রেকটিফিকেশন
(খ) ডি.সি. আউটপুট (হাফ ওয়েভ)
(গ) ফুল-ওয়েভ রেকটিফিকেশন
(ঘ) ডি.সি. আউটপুট (ফুল-ওয়েভ)

এক্স-রে কুইজ—২

বলুন দেখি

১। ক্যাথোড রশ্মির বৈশিষ্ট্য কি কি?
২। এক্স-রে টিউবের ক'টি অংশ?
৩। কিভাবে এক্স-রে উৎপন্ন হয়?
৪। ট্রান্সফর্মার কাকে বলে? কয় ধরনের?
৫। এক্স-রে মেশিনে কি কি ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করা হয়?
৬। রেকটিফায়ার কি জিনিস? কয় ধরনের রেকটিফায়ার আছে?

banglainternet.com

৭। ডায়ওড কি? কয় ধরনের?
৮। ইলেকট্রিক সার্কিট বা বৈদ্যুতিক বর্তনী কি? কয় ধরনের?
৯। এক্স-রে মেশিনে কি কি সার্কিট ব্যবহার করা হয়? তাতে ভোল্টেজ কত?
১০। এ.সি. এবং ডি.সি.র পার্থক্য কি?
১১। বিদ্যুৎ কাকে বলে?
১২। শক্তি কাকে বলে? একক কি?
১৩। রঞ্জন রশ্মির বৈশিষ্ট্য কি?
১৪। "এক্স-রে উৎপাদন কেভি, এম.এ. ও এক্সপোজার টাইম-এ তিনটির উপর নির্ভর করে"—ব্যাখ্যা করুন।
১৫। এক কুলম্ব চার্জ বলতে কি বুঝায়?
১৬। এক ইলেকট্রন ভোল্ট সমান কত শক্তি?
১৭। পদার্থের সাথে এক্সরের কি কি ক্রিয়া-বিক্রিয়া হয়?
১৮। এক এম্পিয়ার কারেন্ট কাকে বলে?
১৯। ওহমের সূত্রটি কি?
২০। এক্স-রে কন্ট্রোল প্যানেলে কি কি থাকে?
২১। এক্স-রে টিউব কেন বায়ুশূন্য রাখা হয়?
২২। এক্স-রে টিউবে টাংস্টেন ধাতু ব্যবহার করা হয় কেন?
২৩। অটোট্র্যান্সফর্মার কি? এক্স-রে মেশিনে কি কাজে লাগে?
২৪। এক্স-রে থেরাপী টিউব বর্ণনা করুন।
২৫। ব্রেমস রেডিয়েশন ও বিশেষ বিকিরণের পার্থক্যসমূহ কি কি?

এক্স-রে থেরাপী টিউব

ইতিপূর্বে যে এক্স-রে টিউব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, সেটা হলো ডায়াগনস্টিক এক্স-রে টিউব। সেটা রোগ-নির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এক্স-রে থেরাপী টিউবের ব্যবহার রোগ চিকিৎসার কাজে। দূরারোগ্য ক্যান্সারের চিকিৎসায় এটি ব্যবহৃত হয়। থেরাপী টিউবের কিছু বিশেষত্ব রয়েছে। যেমন—এটা অপেক্ষাকৃত কম মিলি-এম্পিয়ারে কাজ করে। তবে পিক কিলো-ভোল্ট থাকে তিনশ'র উপরে। এখানে ফোকাল স্পট বড় থাকে।

ডায়াগনষ্টিক এক্স-রে মেশিনে ঘূর্ণায়মান এনোড থাকে। কিন্তু থেরাপী টিউবে ব্যবহৃত হয় স্থির এনোড। এতে তাপ উৎপন্ন হয় বেশি। তাই সেটা প্রতিরোধের জন্য বিশেষ শীতলীকরণ ব্যবস্থার প্রয়োজন।

banglainternet.com

ক্যান্সার আক্রান্ত কলাগুচ্ছের উপর অনেকক্ষণ সময় ধরে এক্স-রে প্রয়োগ করলে জীবন ঘাতি ক্যান্সারের কোষেরা মারা পড়ে। এতে এক্সপোজার টাইম বেশি লাগে। তবে পার্শ্ববর্তী কিছু সুস্থ কোষও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। সেজন্য প্রয়োজন বিশেষ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার। অসতর্কভাবে এক্স-রে থেরাপী প্রয়োগ করা যায় না। তাতে ক্ষতির সম্ভাবনাও থাকে।

ডায়াগনষ্টিক এক্স-রে টিউবে ফিলামেন্ট কয়েল ছোট থাকে। সেটা টাংষ্টেন ধাতুর তৈরি। দৈর্ঘ্য প্রায় এক সেন্টিমিটার, প্রস্থচ্ছেদ ২ মিলিমিটার। কিন্তু থেরাপী টিউবে আরো শক্ত ও মজবুত ফিলামেন্ট কয়েল ব্যবহার করতে হয়। তা না হলে অল্পতেই পুড়ে যেতে পারে। এনোড এংগেল থেরাপী টিউবে ২৬–৩২ ডিগ্রী; গড়ে ৩০ ডিগ্রী।

এক্স-রে থেরাপী টিউবে 'বেরিলিয়াম-উইনডো' ব্যবহার করা হয়। এর কাজ বাড়তি রঞ্জন রশ্মির গতিপথ বন্ধ করা। তবে ডায়াগনষ্টিক এক্স-রে টিউবে এমন কোন ঢাকনা ব্যবহার করা হয় না।

মানব কল্যাণে এক্স-রে

এক্স-রে মানুষের কি কাজে লাগে?

অতীতে এ ধরনের প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই। তবে বর্তমান বিশ্বে এক্স-রে কে বাদ দিয়ে আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান কল্পনা করা যায় না। কারণ এক্স-রে একটি শক্তিশালী রোগ নির্ণয়ের হাতিয়ার।

ধরা যাক, দেহে বুলেট ঢুকেছে। বুলেটটি কোন্ অবস্থানে আছে, বাইরে থেকে বুঝা যায় না। এক্স-রে দিয়ে এর সঠিক অবস্থান জেনে নেয়া যায়। তা দেখে সার্জন অস্ত্রোপচার করে বুলেটটি বের করে আনতে পারে।

অনেক সময় ছোট ছেলে-মেয়েরা খেলাচ্ছলে পয়সা, আলপিন, সেইফটি পিন গিলে ফেলে। সেগুলো হয়ত পাকস্থলী বা অন্ত্রের কোথাও গিয়ে আটকে যায়। এক্স-রে ছবির সাহায্যে তার সঠিক অবস্থান জানা যায়।

মানব কল্যাণে রঞ্জন রশ্মির প্রয়োগ নিয়ে গড়ে ওঠেছে 'রেডিওলজি' নামের চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি নতুন শাখা। আর শুধুমাত্র এক্স-রে ছবি তৈরির ওপর গড়ে ওঠেছে 'রেডিওগ্রাফী' নামের বিষয়। রেডিওগ্রাফী অনেকটা ফটোগ্রাফীর মতোই। ফটোগ্রাফীতে আলোর সাহায্যে ছবি তোলা হয়। আর রেডিওগ্রাফীতে অদৃশ্য আলোক এক্স-রের মাধ্যমে ছবি তৈরি করা হয়।

ইদানিং আলচার, ক্যান্সার বিরল কোন ঘটনা নয়। হয়ত আমাদের আশে পাশেই রয়েছে কোন ক্যান্সারের রোগী। আর পেপটিক আলচার—পরিবার বা আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কেউ না কেউ তো রয়েছেই। এক্স-রের সাহায্যে আলচার, ক্যান্সার, টিউমার এগুলো সঠিকভাবে জানা যায়।

banglainternet.com

শুধু রোগ নির্ণয় নয়, রোগের চিকিৎসায়ও ব্যবহৃত হচ্ছে এক্স-রে। জীবনঘাতি ক্যান্সারের ওপর রঞ্জন রশ্মি প্রয়োগ করে তাকে দমিয়ে দেয়া যায়। হাঁড়-ভাঙ্গা একটি নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। হাঁড়-ভাঙ্গে সড়ক দুর্ঘটনায়, বৃক্ষ বা দালানের ছাদ হতে নীচে পড়লে, হকি স্টীকের আঘাতে। পিচ্ছিল পথে আকস্মিক হুমড়ি খেয়ে পড়েও বহু মানুষ হাঁড়-ভাঙ্গে। আর রোগগত অবস্থাতো রয়েছেই। জটিল ইনফেকশন বা ক্যান্সারের কারণেও বহু হাঁড় ভাঙ্গে। এক্স-রে হলো হাঁড় ও জোড়া বিশেষজ্ঞদের রোগ নির্ণয়ের অমোঘ হাতিয়ার।

ইদানিং রঞ্জন রশ্মির আরো উন্নততর প্রয়োগ শুরু হয়েছে। তার নাম টমোগ্রাফী। এক্স-রের সাহায্যে পরীক্ষণীয় স্থানটিকে টুকরো টুকরো করে ছবি তোলা যায়। হিসাব-নিকাশ আর নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব রয়েছে কম্পিউটারের। তাই পুরো নাম 'কম্পিউটেড-টমোগ্রাফী'। সংক্ষেপে 'সিটি স্ক্যান'। তাই বলতে হয়, মানবকল্যাণে এক্স-রে অতুলনীয়।

এক্স-রের পরিচয় : 'রঞ্জন নামে ডাকো'

'রঞ্জন' নামে এক্স-রের পরিচয়। 'রঞ্জন' শব্দটি এসেছে আবিষ্কারকের নাম হতে। এক্স-রে একটি অদৃশ্য শক্তি হলেও সেটা পরিমাপের জন্য বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন একক উদ্ভাবন করেছেন। সেগুলোকে রেডিয়েশন-ইউনিট বলে। বিকিরণের বিভিন্ন এককের মধ্যে প্রথমেই আসে 'রঞ্জন'। এটা এক্সপোজার পরিমাপের একক। এক রঞ্জন হলো সেই পরিমাণ শক্তি যা প্রতি কেজিতে ২.৫৮ × ১০$^{-৮}$ কুলম্ব চার্জ উৎপন্ন করে। আর এক মিলিরঞ্জন হলো এক রঞ্জনের হাজার ভাগের এক ভাগ।

এক্স-রে বাতাসের ভেতর দিয়ে ছুটে চলে। তারপর এক সময় দেহে পড়ে। শোষিত হয়। সেই শোষিত বিকিরণের একক রেড। এটা প্রতি গ্রাম কলাগুচ্ছে একশো আর্গস শক্তি উৎপন্ন করে। এর আন্তর্জাতিক একক গ্রে। এক গ্রে সমান ১০০ রেড।

১ রেড= ১ সেন্টিগ্রে=১০ মিলিগ্রে।

বিকিরণ দেহ কোষে জৈবিক পরিবর্তন সাধন করতে পারে। এটা বিকিরণের এক বিশেষ গুণ। এর নাম 'কোয়ালিটি ফ্যাক্টর'। বিভিন্ন ধরনের বিকিরণের কোয়ালিটি ফ্যাক্টর ভিন্ন। যেমন–এক্সরে বা গামা-রে—১, নিউট্রন কণা–১০; আলফা পার্টিক্যাল—২০। দেহে শোষিত বিকিরণের তুল্যমান নির্ণয়ের একক রেম। 'রেম' মানে রঞ্জন ইকুইভেলেন্ট ম্যান। এক রেম= রেড × কোয়ালিটি ফ্যাক্টর। রেডকে কোয়ালিটি ফ্যাক্টর দিয়ে গুণ করে রেম পাওয়া যায়। এর আন্তর্জাতিক একক হলো সিভার্ট। এক সিভার্ট= একশো রেম।

তেজস্ক্রিয়তা বা রেডিও একটিভিটি সম্পর্কে ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। তেজস্ক্রিয়তা পরিমাপের একক হলো 'কুরী' এবং 'বেকরেল'। আমরা জানি, তেজস্ক্রিয় পদার্থ সমূহ তেজ বিকিরণ করতে করতে ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। আর তাতে হচ্ছে অবস্থার রূপান্তর। প্রতি সেকেণ্ডে যদি একটি তেজস্ক্রিয় রূপান্তর ঘটে, তার নাম এক বেকরেল। আর এক কুরী হলো সেই পরিমাণ শক্তি যা প্রতি একক সময়ে ৩.৭ ×১০^{১০} বেকরেল উৎপন্ন করে।

BanglaBook.org

এক মিলিকুরী = $১০^{-৩}$ কুরী
এক মাইক্রো কুরী = $১০^{-৬}$ কুরী
এক নেনোকুরী = $১০^{-৯}$
এক পিকোকুরী = $১০^{-১২}$

এক্স-রে ফিল্টার

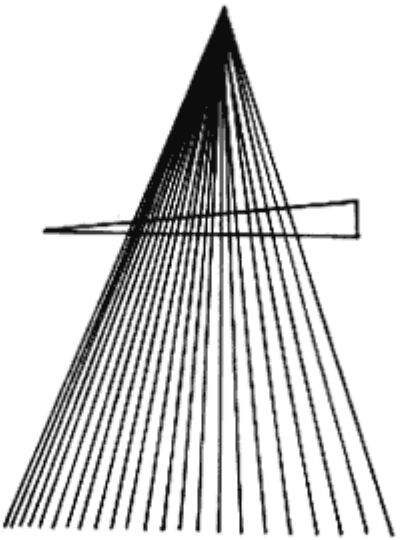

এক্স-রে ফিল্টার

'ফিল্টার' শব্দটির সাথে আমরা সকলেই কম-বেশি পরিচিতি আছি। 'ফিল্টার' মানে ছাকনি। স্কুল-কলেজে ছাত্র-ছাত্রীরা ফিল্টার-পেপার ব্যবহার করে বালি ও লবণের দ্রবণ হতে বালি আলাদা করে। টিউব-ওয়েলে যে ফিল্টার থাকে, সেটা কাদা-মাটিকে আটকে রেখে পরিষ্কার পানিকে ভেতরে আসতে দেয়। তদ্রূপ এক্স-রে ফিল্টার অপ্রয়োজনীয় রশ্মিকে শোষণ করে নেয়।

"ফিল্টার" এক ধরনের পাতলা ধাতব পাত। এটা কম শক্তির রঞ্জন রশ্মিকে শোষণ করে। উচ্চশক্তি সম্পন্ন প্রয়োজনীয় রশ্মিমালাকে সঞ্চালন করে। পদার্থ বিজ্ঞানের ভাষায় এ পদ্ধতির নাম 'ফিলট্রেশন'।

ফিল্টার ধাতব পাত দিয়ে তৈরি। সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় এলুমিনিয়াম। এছাড়াও মলিবডেনাম, বেরিয়াম, গেডোলিনিয়াম, হলমিয়াম ইত্যাদি ধাতুও মাঝে মাঝে ব্যবহৃত হয়। ফিল্টারের একটা মাপ থাকে। পঞ্চাশ কিলো ভোল্টের কম এক্স-রে বীমের জন্য প্রায় এক মিলিমিটার পুরু এলুমিনিয়াম ফিল্টার ব্যবহার করা হয়। এক্স-রে বীমের শক্তি ৫০ হতে ৭০ কিলোভোল্টের মধ্যে হলে ব্যবহার করতে হয় ১.৫ মিলিমিটার পুরু

ফিল্টার। আর ৭০ কিলোভোল্টের উপরের শক্তির জন্য ২.৫ মিলিমিটার পুরু ফিল্টারই যথেষ্ট।

চর্বিজাত কলাতন্ত্র 'স্তনের' বিশেষ এক্স-রের নাম 'মেমোগ্রাফী'। এতে কর্মশক্তির এক্স-রে বীম ব্যবহার করা হয়। প্রায় ২০ হতে ৩০ কিলোভোল্টে মেমোগ্রাফী করা হয়। সেক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হয় মলিবডেনাম-ফিল্টার। সেটার পুরুত্ব মাত্র .০৩ মিলিমিটার। মলিবডেনাম-ফিল্টারের একটা বিশেষ গুণ হলো—সেটা উচ্চ শক্তির রশ্মিগুলোকে শোষণ করে; কিন্তু কমশক্তির রশ্মিগুলোকে সঞ্চালন করে।

কোনস, কলিমেটর, ডায়াফ্রাম

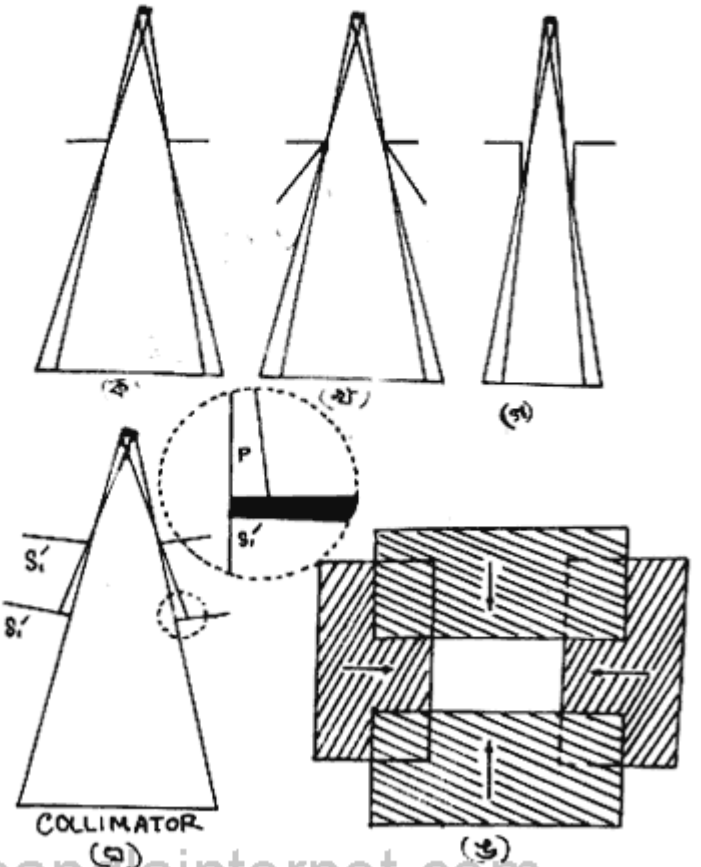

banglainternet.com

(ক) ডায়াফ্রাম, (খ) কোণ, (গ) সিলিন্ডার, (ঘ) কলিমেটর, (ঙ) কলিমেটর-সাটার।

এক্স-রে রশ্মিকে একটা সুনির্দিষ্ট আকৃতি দেয়ার জন্য যেসব জিনিস ব্যবহৃত হয়, সেগুলোর নাম 'বীম লিমিটিং ডিভাইচ' বা সংক্ষেপে বি.এল.ডি.। এ দলে রয়েছে কোনস, সিলিন্ডার, ডায়ফ্রাম, কলিমেটর ইত্যাদি। তবে আধুনিক এক্স-রে মেশিনে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় কলিমেটর। কোনস এক ধরনের লম্বাকৃতি ধাতব ফ্রেম। এর সাহায্যে অপ্রয়োজনীয় রশ্মিকে আংশিক প্রতিরোধ করা যায়। ডায়ফ্রাম সীসার তৈরি একটি পাতলা পাত। এর মাঝখানে একটি ছিদ্র থাকে। সেটা দিয়ে প্রয়োজনীয় রশ্মি বের হতে পারে। এক্স-রে টিউবের ভেতর ডায়ফ্রাম থাকে। ফলে এক্স-রে ছবির গুণাগুণ ভাল হয়।

কলিমেটর আয়তাকার বাক্সের মতো। তাতে একাধিক ডায়ফ্রাম এমনভাবে সেট করা থাকে, যাতে অপ্রয়োজনীয় রশ্মি রোগীর দেহে পৌঁছাতে না পারে। 'এপারচার -ডায়ফ্রাম' ও কোনস এর মূলনীতি একত্রিত করে কলিমেটর তৈরি করা হয়েছে।

এক্স-রে ফিল্ম

ফিল্মের সাথে আমরা সকলেই কম-বেশি পরিচিত। ফিল্ম দেখেনি–এমন লোক আধুনিক সভ্য সমাজে বিরল। নানা ধরনের ফিল্ম রয়েছে। সেগুলোর গঠন আলাদা, কাজও ভিন্ন ভিন্ন। যেমন–ফটোগ্রাফী ফিল্মে ছবি তোলা হয়। এক্স-রে ফিল্মে বঞ্জন রশ্মি পরীক্ষার ছবি তৈরি হয়। বিশেষভাবে তৈরি পোলারয়েড ফিল্মে পোলারয়েড ক্যামেরায় ছবি প্রস্তুত করা হয়েছে। আরো রয়েছে– সিনে ফিল্ম, অডিও কেসেট ফিল্ম, ডুপ্লিকেটিং ফিল্ম ইত্যাদি। বর্তমান বিশ্বে বহু ফিল্ম প্রস্তুতকারী কোম্পানী রয়েছে। তাদের মধ্যে কোডাক, কণিকা, আগফা, ফুজি ইত্যাদি প্রধান।

খালি চোখে ফিল্ম দেখতে প্লাষ্টিকের মতো মনে হলেও আসলে তা হুবহু প্লাষ্টিক নয়। তার উপর বিভিন্ন কেমিক্যাল বা রাসায়নিক পদার্থ দেয়া থাকে। আগে ফিল্মের ভিত্তি হিসেবে প্লাষ্টিক ব্যবহার করা হতো। এখন করা হয় পলিয়েস্টার। এর গায়ে আঠালো পদার্থ দিয়ে গুঁড়ো রাসায়নিক পদার্থের প্রলেপ দেয়া হয়। পলিয়েস্টার স্তরের বৈশিষ্ট্য হলো–এটা বিস্ফোরক বিরোধী, প্রদাহরোধী, ০.২ মিলিমিটার পুরু।

ফিল্মের রাসায়নিক স্তরের নাম 'ফিল্ম-ইমালশন'। সেটা জিলেটিন ও সিলভার হ্যালাইড কৃষ্টাল দিয়ে তৈরি। ইমালশনের পুরুত্ব মাত্র ০.৫ মিল। (১ মিল হলো এক ইঞ্চির হাজার ভাগের এক ভাগ)। সিলভার হ্যালাইডের মধ্যে প্রায় ৯০% সিলভার ব্রোমাইড আর ১০% সিলভার আয়োডাইড থাকে। পুরো যৌগটি সংক্ষেপে 'সিলভার-আয়োডো-ব্রোমাইড' কৃষ্টাল নামে পরিচিত। আর কৃষ্টাল হলো বহুতল বিশিষ্ট দানাদার জিনিস। এক একটি কৃষ্টালের সাইজ প্রায় এক থেকে দেড় মাইক্রন। (এক মাইক্রন=১০$^{-৬}$ সেন্টিমিটার বা এক ইঞ্চির পঁচিশ হাজার চারশ ভাগের এক ভাগ)। প্রতি কৃষ্টালে সিলভার আয়নের সংখ্যা হলো দশ লক্ষ হতে এক কোটি।

banglainternet.com

ফিল্মে সিলভার হ্যালাইড কৃষ্টালের সংখ্যা কত? বিভিন্ন সাইজের ফিল্মে বিভিন্ন রকম। তবে স্বাভাবিক হিসাব মতে, প্রতি কিউবিক সেন্টিমিটার ফিল্ম ইমালশনে প্রায় ৬.৩×১০^৯ সংখ্যক দানা থাকে। অর্থাৎ ফিল্মের গায়ে কোটি কোটি আলোক-সংবেদ্য দানা বসানো থাকে। তার উপর আবার পলিয়েষ্টারের হাল্কা প্রলেপ থাকে। এর নাম সুপার কোটিং।

ফিল্ম ঃ এক্স-রে বনাম ফটোগ্রাফী

ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলার পর ক্যামেরাম্যান অন্ধকারে বিভিন্ন পদক্ষেপে ছবি তৈরি করে। ফিল্ম মাত্রই আলোক সংবেদ্য। আলো পড়লে এর ছবি তৈরির গুণাগুণ নষ্ট হয়। অর্থাৎ ফিল্ম ঝলসে যায়। সেজন্যে ফিল্ম সংরক্ষণ কিংবা প্রসেসিং করতে হয় অন্ধকার ঘরে। যে ফিল্মের ওপর আলো পড়েছে তার নাম 'এক্সপোজড-ফিল্ম'। আর যার উপর পড়েনি তার নাম 'আনএক্সপোজড-ফিল্ম'।

ফটোগ্রাফী ফিল্মে ইমালশনের পুরুত্ব কম, প্রায় দশ হতে পঁচিশ মাইক্রন। সেখানে এক্স-রে ফিল্ম ইমালশনের পুরুত্ব সর্বোচ্চ ৬০০ মাইক্রন পর্যন্ত হতে পারে। দানাদার রাসায়নিক পদার্থ সিলভার হ্যালাইডের পরিমাণ ফটোগ্রাফী ফিল্মে ইমালশনের মোট ওজনের চল্লিশ ভাগ। ঠিক সেটাই এক্স-রে ফিল্মে আশি ভাগ। কণার সাইজ ফটোগ্রাফী হতে রেডিওগ্রাফী ফিল্মে বড়।

সাধারণতঃ এক্সরে ফিল্মের দু'দিকেই রাসায়নিক পদার্থের মিহি প্রলেপ থাকে। এতে প্রতিবিম্ব সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে। তবে চর্বিযুক্ত কলার বিশেষ এক্স-রে মেমোগ্রাফীতে ফিল্মের একদিকে রাসায়নিক প্রলেপ থাকে। এর সুবিধা হলো–এতে আলোর গতিতে দৃষ্টি বিভ্রাট বা প্যারাডক্স সৃষ্টি হয় না।

ফিল্মের বিভিন্ন সাইজ রয়েছে। যেমন–ষ্ট্যাম্প, পাস-পোর্ট, পোস্টকার্ড ইত্যাদি সাইজ। আরো বড় ফিল্ম রয়েছে– ৮″ ×১০″, ১০″ × ১২″, ১২″×১৫″ ইত্যাদি। রেডিওগ্রাফীতে এ তিনটি মাপের ফিল্মই সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়।

ছবি নেয়ার পূর্বে ফিল্ম ঢুকানো হয় ক্যাসেটের ভেতর। তার নাম ফিল্ম হোল্ডার। এর কভার দু'টি। বাইরেরটা ব্যাকালাইট দিয়ে তৈরি। আর ভেতরেরটা সীসা দিয়ে। ব্যাকালাইট রঞ্জন রশ্মি সঞ্চালিত করে। কিন্তু সীসা করে না।

অনেক রকম ফিল্মের মধ্যে চারটি প্রধান। যথা–১. স্ক্রীন-ফিল্ম, ২. নন-স্ক্রীন ফিল্ম, ৩. মেমোগ্রাফী ফিল্ম ও ৪. ডুপ্লিকেটিং।

banglainternet.com

ছবি বিবর্ধক পর্দা

এক্স-রে ছবির গুণাগুণ বৃদ্ধি করার জন্য পদার্থ-বিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন যাবৎ গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁরা এমন কিছু পদার্থ আবিষ্কার করেছেন, যেগুলো রঞ্জন রশ্মি বা এক্স-রে শোষণ করার পর আলোক বিকিরণ করে। ফলে রঞ্জন রশ্মির তীক্ষ্ণতা বাড়ে আর বাড়ে প্রতিবিম্বের গুণাগুণও। বিজ্ঞানীরা সেগুলোর নাম দিয়েছেন ফ্লুরোসেন্ট পদার্থ। যেমন—ক্যালসিয়াম টাংস্টেট ফসফর। এটি এক্স-রে শোষণ করে শক্তি অর্জন করে। তারপর আপনা-আপনিই আলোক বিকিরণ করে। এমন বস্তু দিয়ে তৈরি পর্দার নাম 'প্রতিবিম্ব বিবর্ধক পর্দা' বা 'ইনটেনসিফাইং স্ক্রীন'।

এক একটি পর্দার পুরুত্ব পনেরো থেকে ষোল মিল। (এক মিল হলো এক ইঞ্চির হাজার ভাগের এক ভাগ)। পর্দার যে মূল ভিত্তি, সেটা প্লাষ্টিক বা পলিয়েষ্টার দিয়ে তৈরি। তার পুরুত্ব প্রায় দশ মিল। তার ওপর বসানো থাকে মিহি প্রতিফলক স্তর। এটা টাইটানিয়াম অক্সাইড দিয়ে তৈরি। পুরুত্ব মাত্র এক মিল। এ স্তরে আলোর প্রতিফলন ক্রিয়া দ্রুত ঘটে। তার ওপরেই বিছানো থাকে কৃষ্টাল বা দানাদার স্তর। এটা গুঁড়ো ফসফর-যৌগ দিয়ে তৈরি। পুরো যৌগটির নাম 'ক্যালসিয়াম টাংস্টেট-ফসফর'। এটা ৪–৬ মিল পুরু।

ইনটেনসিফাইং-স্ক্রীন ব্যবহার করার ফলে কম এক্স-রে প্রয়োগে ভাল প্রতিবিম্ব পাওয়া যায়। এতে এক্সপোজার টাইম কম লাগে। রোগীর দেহে কম পরিমাণে বিকিরণ শোষিত হয়। স্ক্রীন তিন ধরনের। যেগুলো তীব্রভাবে বিকিরণ সংবেদ্য; কিঞ্চিৎ রেডিয়েশনে ভাল প্রতিবিম্ব তৈরি করতে পারে, সেগুলো 'হাই স্পীড স্ক্রীন'। আর যেগুলোর ক্ষমতা একেবারেই কম, তাদের নাম 'লো-স্পীড-স্ক্রীন'। এ দুয়ের মাঝামাঝি ক্ষমতাসম্পন্ন স্ক্রীনের নাম 'মিডিয়াম স্পীড স্ক্রীন'। আজকাল হাই স্পীড স্ক্রীনই বেশি ব্যবহৃত হয়।

পদার্থের এ বিশেষ গুণটির নাম 'ফ্লুরিসেন্স'। আর আলোক বিকিরণ যদি কিছুক্ষণ সময় পর্যন্ত স্থায়ী হয়, তার নাম 'ফসফোরিসেন্স'। এক্স-রে-ফ্লুরোস্কোপী মেশিনে যে পর্দা ব্যবহার করা হয়, তার দু'টি গুণই রয়েছে।

banglainternet.com

এক্স-রে গ্রীড

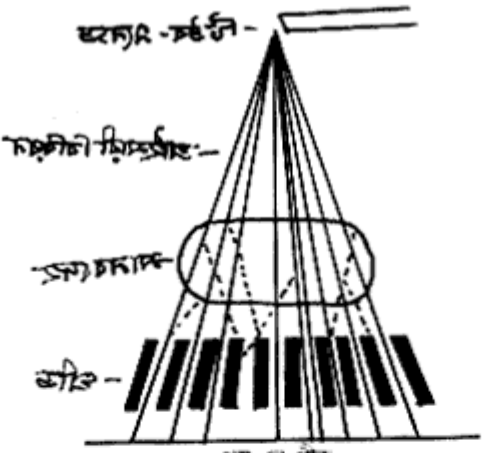

এক্স-রে গ্রীড

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ডাঃ গাসটেভ বাকী এক্স-রে গ্রীড আবিষ্কার করেন। গ্রীড হলো সীসার তৈরি সারিবদ্ধ পাতলা পাত, যা বিক্ষিপ্ত বিকিরণ শোষণ করে। সীসার ফাঁকে এলুমিনিয়াম বা এ জাতীয় অন্য কোন পদার্থ বসানো থাকে। সীসার পাতগুলো সাধারণতঃ .০৫ মিলিমিটার পুরু হয়। গ্রীড দু'ধরনের– স্থির ও গতিশীল। স্থির গ্রীডগুলো পরস্পর সমান্তরাল বা হেলানো অবস্থায় থাকতে পারে। হেলানো গ্রীডের আরেক নাম ফোকাসড গ্রীড।

প্রতি সেন্টিমিটারে কতখানি সীসার পাত থাকে, তাকে বলে গ্রীড-ফ্রিকোয়েন্সী। এটা বিভিন্ন মেশিনে বিভিন্ন রকম। সাধারণতঃ প্রতি ইঞ্চিতে সত্তুর হতে একশো গ্রীড-লাইন থাকে। সীসার পাতের উচ্চতা ও পারস্পরিক দূরত্বের অনুপাতকে গ্রীড অনুপাত বলে। অর্থাৎ গ্রীড অনুপাত=উচ্চতা ÷ দূরত্ব। যেসব মেশিনে শক্তি ৯০ কিলোভোল্টের বেশি থাকে, সেখানে উক্ত অনুপাত থাকে ৮ঃ১। এর ওপরের শক্তির জন্য গ্রীড অনুপাত ধরা হয় ১২ ঃ ১। গ্রীড অনুপাত যত বেশি হবে, তত বেশি পরিমাণে সেটা বিক্ষিপ্ত বিকিরণ অপসারণ করতে পারবে। উক্ত মান প্রস্তুতকারী কোম্পানি কর্তৃক নির্ধারিত হয়।

প্রশ্ন আসে, বিক্ষিপ্ত বিকিরণ কাকে বলে? টিউব-এনোড হতে উৎপন্ন হয়ে যে রঞ্জন রশ্মি দেহে পড়ে তার নাম 'প্রাইমারী-রেডিয়েশন'। দেহ-কোষের সাথে বিভিন্ন ক্রিয়া-বিক্রিয়ার পর যে বিকিরন বের হয়, তাকে বলে 'সেকেণ্ডারী বা ট্রান্সমিটেড-রেডিয়েশন'। এদের মধ্যে যারা দিক পাল্টিয়ে এদিক-সেদিক বিক্ষিপ্তভাবে গমন করে, তারাই বিক্ষিপ্ত বিকিরণ বা 'স্কেটার-রেডিয়েশন'। এটা এক্স-রে প্রতিবিম্বের গুণাগুণ ক্ষুণ্ন করে। তাই সেটা অপসারণের জন্যই গ্রীড ব্যবহৃত হয়।

banglainternet.com

এক্স-রে ডেভেলপার

ফিল্মে আলোক বা রঞ্জন রশ্মি পতনের পর তাতে এক ধরনের অদৃশ্য ছবি তৈরি হয়। আলোক-কণারা যে পদার্থের ছবি বহন করে আনে, তারই প্রতিবিম্ব ফিল্মে সুপ্ত অবস্থায় ফুটে ওঠে। যে রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে সেই অদৃশ্য ছবিকে দৃশ্যমান করা হয়, তার নাম 'ডেভেলপার'।

ডেভেলপার একক কোন পদার্থ নয়। মোট চারটি উপাদানের সংমিশ্রণে এটা তৈরি। সেগুলো হলো ঃ

১। হাইড্রোকুইনন ও মেটল,
২। সোডিয়াম সালফাইট,
৩। সোডিয়াম কার্বনেট, বা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড,
৪। পটাশিয়াম ব্রোমাইড।

উপাদানসমূহের বিভিন্ন রকমের কাজ। যেমন– হাইড্রোকুইনন ও মেটল ছবি তৈরি করে। অর্থাৎ অদৃশ্য ছবিকে দৃশ্যমান করে। সোডিয়াম সালফাইট বায়ু হতে হাইড্রোকুইননের জারণ ক্রিয়া রোধ করে। এটা প্রিজারভেটিভ বা সংরক্ষক হিসেবে কাজ করে। পুরো রাসায়নিক কর্মকাণ্ডকে ত্বরান্বিত করে সোডিয়াম কার্বনেট। কোথাও কোথাও সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডও ব্যবহার করা হয়। এটা হাইড্রোকুইননকে ফিল্ম ইমালশনের ভেতরে ঢুকতে সাহায্য করে। সেজন্য এর নাম 'এক্সিলারেটর'। প্রয়োজনের অতিরিক্ত রাসায়নিক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে পটাশিয়াম ব্রোমাইড। তাকে বলে 'রেসট্রেইনর'।

ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট করার জন্য একটা সুনির্দিষ্ট সময় ও তাপমাত্রা রয়েছে। সাধারণতঃ এক একটা ফিল্ম ৩-৫ মিনিটের ভেতর ডেভেলপ করা যায়। আর এর জন্য প্রয়োজনীয় উষ্ণতা হচ্ছে বিশ থেকে বাইশ ডিগ্রী সেলসিয়াস। আর ফারেনহাইট স্কেলে প্রায় সত্তর ডিগ্রী। উষ্ণতা বাড়লে সময় কমে। আর উষ্ণতা কমলে সময় বাড়ে। ঠাণ্ডায় ডেভেলপারের গুণাগুণ নষ্ট হয়।

উষ্ণতা		সময়	
৬২° ফারেনহাইট	–	$4\frac{1}{2}$ মিনিট	(চার মিনিট ৩০ সেকেণ্ড)
৬৫°	" –	$3\frac{1}{2}$ "	(তিন মিঃ ৩০ সেঃ)
৭০°	" –	$2\frac{1}{2}$ "	(২ মিনিট ৩০ সেঃ)
৭৫°	" –	$2\frac{1}{4}$ "	(দুই মিনিট ১৫ সেঃ)

banglainternet.com

এক্স-রে ফিক্সার

এক্স-রে ফিক্সার। নাম শুনলেই বুঝা যায়, এক্স-রে প্রতিবিম্বকে ফিক্স বা স্থায়ী করার জন্য এটা ব্যবহৃত হয়। ফিল্ম ডেভেলপমেন্টের পর যে ছবি তৈরি হয়, সেটা অস্থায়ী। সামান্য ঘষাতেই মুছে যেতে পারে। সেজন্য ফিক্সার দ্রবণের সাহায্যে ছবিকে ফিল্মের গায়ে শক্তভাবে আটকানো হয়।

ফিক্সার একক কোন রাসায়নিক পদার্থ নয়। এর উপাদান চারটি। যথা–

১। সোডিয়াম থায়োসালফেট বা হাইপো,

২। সোডিয়াম সালফাইট,

৩। পটাশ এলাম বা ক্রোমো এলাম,

৪। সালফিউরিক এসিড।

ফটোগ্রাফী সেন্টারে 'হাইপো' নামের যে রাসায়নিক পদার্থটি পাওয়া যায়, সেটাই সোডিয়াম থায়োসালফেট। এটা ফিল্ম হতে বিকিরণমুক্ত সিলভার হ্যালাইড কৃষ্টালগুলোকে অপসারণ করে রেডিওগ্রাফিক ইমেজকে সুন্দর করে। অনেক সময় হাইপো বাতাসের অক্সিজেনের সংস্পর্শে এসে জারিত হয়। তাতে এর রাসায়নিক গুণাগুণ নষ্ট হয়। সেটা প্রতিরোধ করার জন্য সোডিয়াম সালফাইট ব্যবহার করা হয়। সেজন্য একে বলে 'প্রিজারভেটিভ' বা সংরক্ষক উপাদান।

ফিল্মের জিলেটিনকে শক্ত করে পটাশ এলাম বা ক্রোমো এলাম। জিলেটিন শক্ত না হলে ফিল্ম হতে ছবি উঠে যায়। ফিল্মে সহজেই বিভিন্ন রকমের দাগ পড়ে। সালফিউরিক এসিড ফিল্ম হতে অতিরিক্ত এলকালি অপসারণ করে।

ফিক্সেসন একটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। এর জন্য একটা সুনির্দিষ্ট সময় ও উষ্ণতা রয়েছে। সময় হলো দু'হতে পাঁচ মিনিট; দশ মিনিটের কম। আর উষ্ণতা ২০–২৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস। ফারেনহাইট স্কেলে ৬৮–৭৫ ডিগ্রী।

পুরাতন ফিক্সার দ্রবণ হতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অপসারণ করে সমপরিমাণ নতুন ফিক্সার যোগ করাকে 'রেফলিনিশমেন্ট' বলে। এতে ফিক্সারের গুণাগুণের কোন ক্ষতি হয় না।

অন্ধকার ঘরে ছবি তৈরি

অন্ধকার ঘরে ছবি তৈরি করাকে 'ফিল্ম-প্রসেসিং' বলে। এটা দু'ভাবে করা যায়। একটা-ম্যানুয়ালী অর্থাৎ হাত দিয়ে। অন্যটা-যন্ত্রের সাহায্যে। যন্ত্রের সাহায্যে ফিল্ম প্রসেসিং করাকে 'অটোমেটিক ফিল্ম প্রসেসিং' বলে। এতে সময় কম লাগে। প্রতিবিম্ব সুন্দর হয়।

banglainternet.com

যে প্রক্রিয়ায় এক্স-রে ফিল্মে এক্সপোজার দেয়ার পর ডার্ক রুমে বিভিন্ন পদক্ষেপে সুপ্ত ছবিকে দৃশ্যমান করা হয়, পদার্থ বিজ্ঞানের ভাষায় তাকে ফিল্ম-প্রসেসিং বলে।

পাঁচটি পদক্ষেপে এটা সম্পন্ন হয়। সেগুলো একের পর এক সম্পন্ন করতে হয়। যথা–১. ডেভেলপমেন্ট, ২. রিনজিং, ৩. ফিক্সেশন, ৪. ওয়াশিং এবং ৫. ড্রাইং।

ছবি তৈরি করা বা ডেভেলপমেন্ট সম্পর্কে ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। ছবি তৈরির পর ফিল্মকে চলন্ত পানিতে ত্রিশ সেকেণ্ড ধৌত করতে হয়। এর নাম 'রিনজিং'। এটা না করলে ফিক্সার দ্রবণ ভালভাবে কাজ করে না। অন্যদিকে ডেভেলপার দ্রবণ ফিক্সারে মিশে ফিক্সারের গুণাগুণ নষ্ট করে। রিনজিং এর জন্য পানির সাথে ১% এসেটিক এসিড মেশালে ভাল ফল পাওয়া যায়। অটো-প্রসেসর মেশিনে রিনজিং লাগে না।

ছবি স্থায়ী করা বা ফিক্সেশন খুব কঠিন কাজ নয়। এটা ভালভাবে করলে ছবি সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে। ফিক্সেশনের পর ফিল্ম ধৌত করাকে ওয়াশিং বলে। এটা সুন্দরভাবে না করলে হাইপো বা সোডিয়াম থায়োসালফেট কণা ফিল্মের গায়ে লেগে থাকে। তাতে কালো ধাতব সিলভার বাদামী রঙ ধারণ করে। স্বাভাবিক ওয়াশিং টাইম ১৫–৩০ মিনিট।

ফিল্ম শুকানোর জন্য বাতাস এবং তাপের দরকার। অনেকে ফিল্ম ঝুলিয়ে রেখে পাখা ছেড়ে দেয়। তাতেই ফিল্ম ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায়। ইদানিং অটোমেটিক ফিল্ম-ড্রায়ার বেরিয়েছে। সেটার সাহায্যে খুব কম সময়েই ফিল্ম শুকানো যায়। ম্যানুয়েল পদ্ধতিতে ফিল্ম শুকাতে সময় লাগে ১৫–২০ মিনিট।

অটোমেটিক ফিল্ম-প্রসেসিং

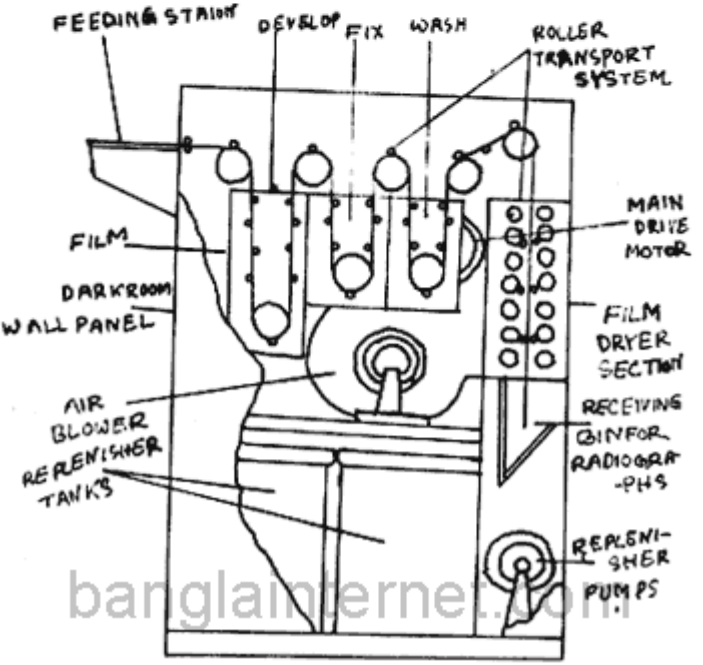

banglainternet.com

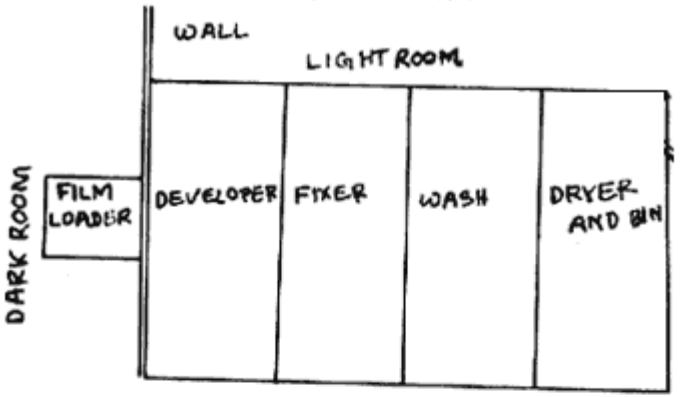

অটোমেটিক ফিল্ম-প্রসেসিং

এটা বিজ্ঞানের যুগ। এখন মানুষের অনেক কাজ করে দিচ্ছে মেশিন। তাতে সুবিধে অনেক। সময় কম লাগে। খরচও পড়ে কম। আগে যে ফিল্ম-প্রসেসিং হাত দিয়ে করা হতো, এখন উন্নত বিশ্বে সেটা করছে মেশিন। এর নাম অটোমেটিক ফিল্ম-প্রসেসর। আমাদের দেশেও উক্ত প্রযুক্তি চালু হয়েছে। এতে কম সময়ে অনেক বেশি সংখ্যক ফিল্ম-প্রসেসিং করা যায়। যন্ত্রে এক একটা ফিল্ম-প্রসেসিং করতে সময় লাগে মাত্র ২৫-৩০ সেকেণ্ড। অথচ হাতে করলে প্রায় আধা ঘন্টার মতো সময় লাগে। মেশিনে চারটি পদক্ষেপে ফিল্ম-প্রসেসিং করা হয়। যথা—

১. ডেভেলপমেন্ট, ২. ফিক্সেশন, ৩. ওয়াশিং, ৪. ড্রাইং। এখানে রিনজিং করার প্রয়োজন হয় না। ডেভেলপার হিসেবে ব্যবহার করা হয় হাইড্রোকুইনন ও ফেনিডন। কালো দাগ দূর করার জন্য ডেভেলপারে এলডেহাইড যৌগ যোগ করা হয়। অটোপ্রসেসর মেশিনে প্রতি পদক্ষেপে উষ্ণতা ও সময়-(ক) ডেভেলপমেন্ট-৩৫° সেলসিয়াস-২৫ সেকেণ্ড; (খ) ফিক্সিং-৩৫°, ২১ সেকেণ্ড, (গ) ওয়াশিং-৩৫°, ৯ সেকেণ্ড; (ঘ) ড্রাইং-৫৭° সেলসিয়াস-২০ সেকেণ্ড।

ডার্ক-রুম পরিকল্পনা

এক্স-রে ফিল্ম প্রসেসিংয়ের জন্য ডার্ক-রুম বা অন্ধকার ঘর খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্থান। কেননা প্রতিবিম্বের গুণাগুণ অনেকাংশে ডার্ক রুমের ওপর নির্ভর করে। এক্স-রে ডার্ক রুম অন্য একটা অন্ধকার ঘরের মতো নয়। এর রয়েছে কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। যেমন-এটি সব সময়ই এক্স-রে রুমের কাছাকাছি থাকতে হবে যাতে ছবি তোলার সাথে সাথেই ফিল্ম-ভর্তি কেসেট নিয়ে অন্ধকার ঘরে যাওয়া যায়।

banglainternet.com

এক্স-রে ডার্ক রুম লাইট-প্রুফ বা আলো প্রতিরোধী হতে হবে। কেননা কোন ফাঁক-ফোকর দিয়ে যদি আলো ঢুকতে পারে তাহলে সেটা ফিল্মের গুণাগুণ নষ্ট করবে।

আমরা সকলেই জানি, এক্স-রে ফিল্মও ফটোগ্রাফী ফিল্মের মতো আলোক-সংবেদ্য। আলো পড়া মাত্রই এতে সুপ্ত ছবি উৎপন্ন হয়। তাই আন-এক্সপোজড ফিল্ম কেসেটে ঢুকানোর সময় বা এক্সপোজড ফিল্ম কেসেট হতে বের করে প্রক্রিয়াজাত করার সময় কোন ভাবেই আলো পড়তে পারবে না।

রুমটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হলে উত্তম। চার দেয়াল ও ছাদ হবে লাইট-প্রুফ। আর মেঝে, কেমিক্যাল-প্রুফ। অর্থাৎ কোন রাসায়নিক দ্রবণ মেঝেতে পড়লে যেন মেঝে ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। দরোজা ইলেকট্রিক্যাল ইন্টারলকড বা 'পাস-বক্স' ডোর হতে হয়। এর মানে দুই দেয়ালের দরোজা। একটা অংশ সামনে, অন্যটা পেছনে। দু'টোর মাঝখানে সামান্য ফাঁক থাকতে হবে। প্রথমে একটা খুলে মাঝখানের অন্ধকার স্থানে প্রবেশ করতে হয় বা কেসেট রাখতে হয়। তারপর প্রথমটি বন্ধ করা হয় এবং দ্বিতীয়টি খোলা হয়। এতে ভেতরে কোনভাবেই আলোক ঢুকতে পারে না।

অন্ধকার ঘরে কিছু যন্ত্রপাতি থাকে। যেমন—দু'টো নাড়ানি, একটা থার্মোমিটার, চারটি ট্যাংক, ফিল্ম ষ্টোরেজ বিন, ফিল্ম হ্যাংগার, ফিল্ম ড্রায়ারস ইত্যাদি। থার্মোমিটারের সাহায্যে মাঝে মাঝে ডেভেলপার ও ফিক্সার দ্রবণের তাপমাত্রা পর্যবেক্ষণ করতে হয়। তাপমাত্রা কমে গেলে ফিল্মের গুণাগুণ নষ্ট হয়। ফিল্ম সংরক্ষণের জন্য 'ষ্টোরেজ-বিন' ব্যবহার করা হয়। চারটা ট্যাংকের মধ্যে একটায় ডেভেলপার দ্রবণ, একটায় ফিক্সার দ্রবণ, একটায় রিনজিং ওয়াটার ও অন্যটায় ফিল্ম ওয়াশিংয়ের জন্য পানির ব্যবস্থা থাকে।

ডার্ক-রুম সমস্যা

ডার্ক-রুমের কারণে ফিল্মে বিভিন্ন কৃত্রিম দাগ সৃষ্টি হয়। সেগুলো অনিচ্ছাকৃত ভাবেই ফিল্মে পড়ে প্রতিবিম্বের গুণাগুন নষ্ট করে। পদার্থ বিজ্ঞানের পরিভাষায়, তাদেরকে 'আর্টিফ্যাকট' বলে। সেগুলো নির্ভুলভাবে চিহ্নিত করে সমাধানের উপায় বের করা অত্যাবশ্যক।

ফিল্মে বিভিন্ন রকমের সমস্যা দেখা দেয়। তাদের মধ্যে তিনটি প্রধান, যথা—ফগিং, রঙিন দাগ ও অন্যান্য দাগ। ফিল্ম পুরো কালো হয়ে যাওয়াকে ফগিং বলে। এর কারণ ফিল্মে আলো লাগা, ফিল্মে পূর্বেই রেডিয়েশন পড়া, দুর্বল ডেভেলপার, মেয়াদোত্তীর্ণ ফিল্মের ব্যবহার ইত্যাদি।

ফিল্ম কালো হওয়া ছাড়াও তাতে বিভিন্ন রকমের রঙিন দাগ পড়ে। যেমন—বাদামী রঙ। ডেভেলপার বাতাসের অক্সিজেনের সংস্পর্শে জারিত বা নষ্ট হলে ফিল্ম বাদামী রঙ ধারণ করে। আর ফিক্সেশন ঠিক মতো না হলে ফিল্ম হয় ধূসর-হলুদ বর্ণের। আবার ওয়াশিং বা ধৌতকরণ ত্রুটিপূর্ণ হলেও ধূসর সাদা রঙ ধারণ করে।

banglainternet.com

কেসেট বা পর্দায় অনেক সময় বালি জমে। সেগুলো শুকনো তুলো দিয়ে মাঝে মাঝে পরিষ্কার করতে হয়। তা না হলে সেগুলোর দাগও সময় সময় ফিল্মে পড়ে। ছবি-বিবর্ধক পর্দা পরিষ্কার করতে কখনো পানি বা ডিটারজেন্ট ব্যবহার করা ঠিক নয়। তাতে পর্দার প্রতিফলক স্তর ও ফসফর কৃষ্টালের গুণাগুণ নষ্ট হয়।

ফিল্মে আংগুলের বা নখের দাগ পড়লে তাকে ক্রিংকল বলে। এগুলো গোলাকার কিংবা বাঁকানো কালো দাগ। কেসেটে ময়লা জমলে তার নাম কেসেট মার্ক। অনেক সময় বিন্দু বিন্দু পানির দাগও দেখা যায়। তাদেরকে ওয়াটার মার্ক বলে। আবার কখনো সাদা লম্বা দাগ বা স্ক্রীক-মার্কও দৃশ্যমান হয়।

ফিল্ম-প্রসেসিংয়ে ডার্ক রুম সমস্যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কেননা বহুরূপী কৃত্রিম দাগের কারণে অনেক সময় সঠিক সমস্যা ভালভাবে ধরা পড়ে না। আবার কখনো ঐ কৃত্রিম দাগকেই জটিল রোগগত সমস্যা বলে চিহ্নিত করা হয়। সুস্বাস্থ্য অর্জনের লক্ষ্যে এটা আমাদের অভিপ্রেত নয়।

এক্স-রে প্রতিবিম্ব

এক্স-রে প্রতিবিম্ব বা রেডিওগ্রাফিক ইমেজ সুন্দর ও নিখুঁতভাবে ফুটে ওঠাকে রেডিওগ্রাফিক কোয়ালিটি বলে। এটা উন্নতমানের হলে পাশাপাশি অবস্থিত ভিন্ন ভিন্ন ঘনত্বের কলাতন্ত্রকে নিখুঁতভাবে আলাদা করে দেখা সম্ভব। এক্স-রে প্রতিবিম্ব যেন একটা আলোকচিত্র বা ফটোগ্রাফ। ফটোগ্রাফে যেমন মুখের আদল, জামার ভাঁজ, রঙ ইত্যাদি সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে, তেমনি ভাল রেডিওগ্রাফেও পরীক্ষিত কলাতন্ত্রের ছবি জীবন্ত হয়ে ধরা দেয়।

আলোক বা বিকিরণ প্রক্ষেপণের পর ফিল্ম-প্রসেসিং শেষ হলে ফিল্মের গায়ে রঙের পার্থক্য দেখা যায়। কোনটা কালো, কোনটা সাদা, আবার কোনটা ধূসর। বলা যায়, এটা ফিল্ম-ইমালশনের এক ধরনের যোগ্যতা, যার ফলে বিস্তৃত বর্ণালীতে এক্স-রে প্রতিবিম্ব তৈরি হয়। এর নাম 'ফিল্ম-লেটিচিউড'। উদাহরণস্বরূপ, হাঁড় সাদা, বাতাস কালো আর নরম মাংশ পেশী এ দুয়ের মাঝামাঝি রঙ ধারণ করে। রেডিওগ্রাফীতে একে 'কন্ট্রাষট' বলে। সঠিক রোগ নির্ণয়ের জন্য কন্ট্রাষ্ট ভাল হওয়া দরকার।

বস্তুর প্রকৃত চেহারা বা আকার-আকৃতি যদি প্রতিবিম্বে পরিবর্তিত হয় কিংবা বিকৃত হয়ে ফুটে ওঠে তার নাম 'প্রতিবিম্ব-বিকৃতি' বা ইমেজ ডিসটরশন। এ এক জটিল সমস্যা। এতে এক্স-রে কোয়ালিটি দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ধরা যাক, একজন ফটোগ্রাফার একটি ফুটন্ত গোলাপের ছবি তুললেন। কিন্তু ফিল্ম-প্রসেসিং শেষে দেখা গেল ফুলটি গোলাপ নয় জবা, গন্ধরাজ বা অন্য কিছু। অর্থাৎ প্রতিবিম্বে চেহারার বিকৃতি ঘটেছে। সংক্ষেপে এটাই ইমেজ ডিসটরশন। এ ব্যাপারে ফটোগ্রাফারের মতো রেডিওগ্রাফারকেও সব সময় সতর্ক থাকতে হয়।

banglainternet.com

ছবি তৈরির যাবতীয় কাজ-কর্ম সম্পন্ন করতে হয় অন্ধকার ঘরে। এ যেন রেডিওগ্রাফিক-ফটোগ্রাফী। এক্স-রে ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলা সহজ নয়। এর জন্য প্রয়োজন ভাল প্রশিক্ষণের। এক্স-রে টিউবের ফোকাস হতে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে ফিল্ম রাখতে হয়। তার নাম এফ. এফ. ডি. বা সংক্ষেপে ফিল্ম-ফোকাস ডিসট্যান্স। এটা প্রায় ১০০-১২০ সেন্টিমিটার বা ৪০ ইঞ্চি। ভাল প্রতিবিম্ব তৈরির জন্য এটি একটি ফ্যাক্টর। আবার বস্তু ও ফিল্মের মধ্যে কয়েক মিলিমিটার থেকে সেন্টিমিটার ব্যবধান থাকে। তার নাম ও. এফ. ডি. বা অবজেক্ট-ফোকাস-ডিসট্যান্স।

এক্স-রে ফিল্মের ঘনত্ব

এক্স-রে ফিল্ম কেন সাদা-কালো?

বস্তুর ঘনত্ব উহার গুণগত অবস্থা নির্দেশ করে। ঘনত্বের পরিমাপ করে বস্তুর গুণাগুণ সম্পর্কে ধারণা নেয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় দুধের কথা। ল্যাকটোমিটার নামক যন্ত্রের সাহায্যে দুধের ঘনত্ব মেপে জানা যায়- দুধ খাঁটি না ভেজাল মিশ্রিত। তদ্রুপ এক্স-রে ফিল্মের ব্যাপারেও একই কথা। সেখানে ডেনসিটি বা ঘনত্ব পরিমাপ করা হয় 'ডেনসিটোমিটার' নামক যন্ত্রের সাহায্যে। এটা এক ধরনের ইলেকট্রনিক যন্ত্র। আলোক প্রক্ষেপণ প্রক্রিয়ায় এটা কাজ করে। প্রথমে এক্সপোজড ফিল্মের ওপর আলোক রশ্মি ফেলা হয়। তারপর ফিল্মের ভেতর দিয়ে সঞ্চালিত রশ্মির তীব্রতা পরিমাপ করে জানা যায় ফিল্মের ঘনত্ব।

ঘনত্বের একটা স্বাভাবিক সীমা রয়েছে। এর বেশি বা কম-দু'টোই খারাপ। সাধারণতঃ রেডিওগ্রাফিক ডেনসিটি হচ্ছে .২০ হতে .৫০। এ মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে ফিল্ম কালো হয়ে যায়। ঘনত্ব ২ বা তদোর্ধ হলে ফিল্ম একেবারেই কালো দেখা যায়। আবার .২০ এর কম হলেও ছবি ভাল আসে না। সেক্ষেত্রে ফিল্মের রঙ হয় সাদা বা ধূসর।

মানবদেহ বিভিন্ন রকমের কলাতন্ত্র দিয়ে গঠিত। যেমন-শক্ত হাঁড়, নরম মাংশপেশী ও মেদময় কলা, গ্যাস ধারণকারী দীর্ঘ পৌষ্টিক নালী ইত্যাদি। বিভিন্ন কলার এক্স-রে শোষণ করার ক্ষমতা বিভিন্ন। এটা নির্ভর করে পদার্থের আণবিক সংখ্যা ও ঘনত্বের ওপর। শারীর বিজ্ঞানীরা দেহের বিভিন্ন কলাতন্ত্রের গঠন বের করেছেন। তার থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, হাঁড়ের আণবিক সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, ১৩.৮। নরম কলাতন্ত্রের আণবিক সংখ্যা ৭.৪ এবং চর্বির ৫.৮। সেজন্য হাঁড় এক্স-রে বেশি শোষণ করে এবং ফিল্মে সাদা বর্ণ ধারণ করে। আবার বাতাস রঞ্জন রশ্মি একেবারেই কম শোষণ করে বলে কালো রঙে ধরা দেয়। কালো আর সাদার মাঝামাঝি রঙে থাকে নরম কলাতন্ত্র। আবার বস্তুর ঘনত্বও এখানে ভূমিকা রাখে। হাঁড়ের ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি, ১.৮৬, তারপর নরম কলাতন্ত্র=১, সবচেয়ে কম চর্বির ঘনত্ব=.৯। সেজন্য কম কিলোভোল্টে ফ্যাটি টিস্যুর এক্স-রে করতে হয়। নচেৎ সেটা কালো রঙ ধারণ করে। এটাই মোমোগ্রাফী এক্স-রের মূল ভিত্তি।

banglainternet.com

মেমোগ্রাফী

মেমোগ্রাফী কাকে বলে?

এক বিশেষ ধরনের এক্স-রের নাম মেমোগ্রাফী। এর সাহায্যে মাংশ-পেশী হতে নরম চর্বিযুক্ত কলাকে আলাদা করে দেখা যায়। এখানে টাংস্টেন ধাতু ব্যবহার করা হয় না। তার পরিবর্তে মলিবডেনাম বা রোডিয়াম ধাতু ব্যবহার করা হয়। মানবদেহে বিভিন্ন রকমের কলাতন্ত্র রয়েছে। যেমন— পেশী, রক্ত, ত্বক-নিম্ন কলা, ফ্যাট ইত্যাদি। সাধারণ এক্স-রে প্রক্রিয়ায় ফ্যাটি টিস্যু ভালভাবে দৃশ্যমান হয়না। তাই পদার্থ বিজ্ঞানের ভাষায়, মেদময় কলার সমন্বয়ে গঠিত স্তনের এক্স-রে প্রক্রিয়াকে মেমোগ্রাফী বলে।

সাধারণ এক্স-রে মেশিন চল্লিশ কিলোভোল্টের নীচে চালানো নিরাপদ নয়। কিন্তু মেমোগ্রাফী করতে হয় ২০ হতে ৩০ কিলোভোল্টের ভেতর। এত কম কিলোভোল্টে চালাতে গেলে কারেন্টের পরিমাণ বা মিলি-এম্পিয়ারের মান বাড়াতে হয়। সেটা প্রায় ১২০০ হতে ১৮০০ পর্যন্ত উঠাতে হয়। এটা এক্স-রে টিউবের জন্য ক্ষতিকর ও ঝুঁকিপূর্ণ।

মেমোগ্রাফীতে মলিবডেনাম ব্যবহার করা হয়। মলিবডেনাম একটি বিশেষ ধাতু। এর আণবিক সংখ্যা ৪২। সংকেত MO। এটা মেমোগ্রাফীতে টার্গেট বা পজেটিভ হিসেবে কাজ করে। আবার ফিল্টার হিসেবেও এরি ব্যবহার। মলিবডেনামে ২০ হতে ৩০ কিলোভোল্ট কারেন্ট চালিত হলে দু'ধরনের শক্তি উৎপন্ন হয়। এদের মান যথাক্রমে ১৯.৫ এবং ১৭.১। মেমোগ্রাফীর জন্য গড়ে ১৭.৫ কিলোভোল্ট শক্তির দরকার। মলিবডেনাম ফিল্টার উক্ত বিশেষ বিকিরণ সঞ্চালন করে। কিন্তু সাধারণ বিকিরণকে আটকে রাখে, যা টাংস্টেন পারে না। টাংস্টেন ফিল্টার বহু শক্তির সমন্বয়ে তৈরি সাধারণ বিকিরণকে সঞ্চালন করে।

টাংস্টেন ধাতুর আণবিক সংখ্যা ৭৪। সাধারণ এক্স-রে টিউবে এটাই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু মেমোগ্রাফীতে এটা ব্যবহার করা যায় না। মেমোগ্রাফীর কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন–কম কিলো-ভোল্ট ব্যবহার, এক্স-রে বীমকে কম ফিল্টার করা, ক্ষুদ্র ফোকাল স্পট, মলিবডেনাম টার্গেট ও ফিল্টার ব্যবহার ইত্যাদি।

banglainternet.com

মেমোগ্রাফীর সাহায্যে স্তনের বহু জটিল রোগ যেমন ক্যান্সার নির্ণয় করা যায়।

কন্ট্রাষ্ট-মেটেরিয়াল

রঞ্জক পদার্থের সাহায্যে কিভাবে এক্স-রে প্রতিবিম্ব তৈরি করা যায়?

বিভিন্ন ধরনের কলাতন্ত্র দিয়ে মানব দেহ তৈরি। এক্স-রের সাহায্যে সেগুলোর সুন্দর প্রতিবিম্ব তৈরি করা যায়। তবে এমন কিছু পদার্থ আছে, যেগুলোর ছবি স্বাভাবিকভাবে ফুটে ওঠে না। তাদের মধ্যে রয়েছে পৌষ্টিক নালী, শিরা-ধমনী এবং রক্ত জালিকা বিন্যাস। এদের ভেতর বিশেষ উপায়ে রঞ্জক পদার্থ ঢুকিয়ে ভাল প্রতিবিম্ব তৈরি করা যায়।

রেডিওগ্রাফীতে যেসব জিনিস ব্যবহার করলে ভাল প্রতিবিম্ব তৈরি হয়, সেগুলোকে কন্ট্রাষ্ট মেটেরিয়াল বলে। যেমন–বেরিয়াম, আয়োডিন ইত্যাদি।

বেরিয়ামের আণবিক সংখ্যা ৫৬। এটা বেরিয়াম সালফেট লবণ আকারে পাওয়া যায়। তবে কখনো বেরিয়াম সালফাইড নয়। কেননা এটা বিষাক্ত। বেরিয়াম সালফেট লবণ পানির সাথে মেশালে সাদা দুধের মতো দেখায়। এটা খাইয়ে পৌষ্টিক নালীর বিভিন্ন অংশ যেমন—খাদ্য নালী, পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত ইত্যাদির ছবি নেয়া যায়। তাতে কোন জটিল রোগগত অবস্থা আছে কিনা সে বিষয়েও নিশ্চিত হওয়া যায়। বেরিয়াম এক্স-রের সাথে সবাই কম-বেশি পরিচিত। আজকাল পাকস্থলীর আলচার, ক্যান্সার নির্ণয়ে এর ব্যবহার ব্যাপক।

আরেকটি জনপ্রিয় রঞ্জক পদার্থ আয়োডিন সমৃদ্ধ যৌগ। এর সাহায্যে কিডনি ও মূত্রতন্ত্র, রক্তনালী, হৃদধমনী, মগজের সুষুম্নাকাণ্ড ইত্যাদির ভাল এক্স-রে প্রতিবিম্ব তৈরি করা যায়। দু'টি যৌগ খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। তাদের মধ্যে রয়েছে 'আয়োপামিডল' এবং 'সোডিয়াম ডায়াট্রিজয়েট'। এগুলো শিরা বা ধমনীর মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে রক্ত প্রবাহের সাথে এগুলোও সঞ্চালিত হয়। তখন সেসব এলাকা রঞ্জন রশ্মি প্রতিবিম্বে ধরা পড়ে।

সাধারণতঃ রঞ্জক পদার্থসমূহের কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। তবে বিরল ক্ষেত্রে বমি বমি ভাব, বমি, চুলকানি, শ্বাসকষ্ট, রক্তচাপ কমে যাওয়া ইত্যাদি হতে পারে। সেসব ক্ষেত্রে সতর্কতার প্রয়োজন রয়েছে।

এক্স-রে কুইজ–৩

বলুন দেখি

১। ফিল্ম তৈরি কেমন করে?

২। এক্স-রে ফিল্ম ও ফটোগ্রাফী ফিল্মের মধ্যে তফাৎ কি?

banglainternet.com

৩। এক্স-রে ফিল্ম কয় ধরনের?
৪। ফিল্টারের কাজ কি?
৫। এক্স-রে গ্রীড কি দিয়ে তৈরি?
৬। ডেভেলপারের উপাদানসমূহ কি কি?
৭। এক্স-রে ফিল্ম ডেভেলপমেন্টের প্রয়োজনীয় সময় ও উষ্ণতা কত?
৮। ফিক্সারের উপাদানসমূহ কি কি?
৯। রেডিওগ্রাফিক-ফটোগ্রাফী বলতে কি বুঝায়?
১০। ডার্ক রুমের বৈশিষ্ট্যসমূহ কি কি?
১১। 'রেফলিনিশমেন্ট' কাকে বলে?
১২। কলিমেটরের কাজ কি?
১৩। ইনটেনসিফাইং স্ক্রীন কি দিয়ে তৈরি?
১৪। ফিল্ম-প্রসেসিং কাকে বলে?
১৫। ফিল্ম-প্রসেসিংয়ের পাঁচটি পদক্ষেপ কি কি?
১৬। অটোমেটিক ফিল্ম প্রসেসিংয়ের সুবিধা কি?
১৭। মেমোগ্রাফীতে কি ধরনের ফিল্টার ব্যবহার করা হয়?
১৮। এক্স-রে কন্ট্রাষ্ট কাকে বলে?
১৯। এক্স-রে ফিল্ম কেন সাদা-কালো?
২০। ফিল্ম-ডেনসিটি বলতে কি বুঝায়?
২১। বীম-লিমিটিং ডিভাইচ কাকে বলে? কি কি আছে?
২২। 'ফিল্ম-ফগিং' কি? কি কি কারণে ফিল্ম কালো রঙ ধারণ করে?
২৩। এক্স-রে গ্রীড কে আবিষ্কার করেন?
২৪। 'আর্টিফ্যাক্ট' বলতে কি বুঝায়?
২৫। এক্স-রে ফিল্ম কখন বাদামী রঙ ধারণ করে?

বিকিরণের বিপদ

এক্স-রে কখন ক্ষতিকর?

বিকিরণের একটা সর্বোচ্চ নিরাপদ সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। এটা দেহের জন্য আজীবন ঝুঁকিপূর্ণ নয়। এর নাম এম.পি.ডি. বা মেক্সিমাম পারমিসিবল ডোজ। এটা বছরে পাঁচ রঞ্জন বা পঞ্চাশ মিলিসিভার্ট ধরা হয়েছে। দেহে শোষিত বিকিরণ উক্ত ডোজ অতিক্রম করলে সেটা দেহের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিকিরণের বিপদ সরাসরি ডোজের সাথে সম্পর্কিত। বিকিরণের মাত্রা বাড়লে ঝুঁকির পরিমাণও বাড়ে। ইহা বিলম্বিত দৈহিক ও বংশগত ত্রুটি সৃষ্টি করে। অনেক সময় একটা নূন্যতম ডোজ অতিক্রম না করলে বিকিরণের বিপদ ঘটে

banglainternet.com

না। সেটা অতিক্রম করার পর আকস্মিকভাবে বিপদের ঝুঁকি বাড়ে। ইহা তড়িৎ দৈহিক ক্ষতি সাধন করে।

অতি মাত্রায় বিকিরণ দেহের জন্য ক্ষতিকর। বিকিরণের তাৎক্ষণিক অসুবিধাসমূহের মধ্যে রয়েছে বমি বমি ভাব, বমি, রক্তক্ষরণ, ডায়রিয়া, এমনকি মৃত্য। বিকিরণের দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতি হিসেবে দেখা দেয় ক্যান্সার, বৃদ্ধি থেমে যাওয়া, বন্ধ্যাত্ব, স্মৃতিলোপ ইত্যাদি। আবার কখনো ভ্রূণ-বৈকল্য বা মৃত সন্তানের জন্ম হতে দেখা যায়।

বিকিরণ বিভিন্নভাবে দেহের ক্ষতি সাধন করে। এটা দেহে শোষিত হওয়ার পর দেহের জলীয় অংশের সাথে বিক্রিয়া করে। তাতে উৎপন্ন হয় কিছু ক্ষতিকারক যৌগ। যেমন—ফ্রি অক্সিজেন রেডিক্যাল, হাইড্রোজেন-পার-অক্সাইড, হাইড্রো-পার-অক্সিল ইত্যাদি। এগুলো জীবকোষের ক্রোমোজোমে পরিবর্তন ঘটায়। ডি.এন.এ. শিকল ভেঙ্গে যায়। নতুন আর.এন.এ. তৈরি হয়। কখনো বা তৈরি হয় 'অনকো-প্রোটিন' বা 'ক্যান্সার-প্রোটিন'। কোষে দেখা দেয় মিউটেশন বা পরিবৃত্তি। পরিণামে হয় ক্যান্সার। এটা বংশধারায় সংক্রামিত হয়। যুগ যুগ ধরে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আক্রান্ত হয় বিভিন্ন ধরনের জীবনঘাতী ক্যান্সারে। এ বিষয়ে সকলের সতর্ক হওয়া দরকার।

রেডিয়েশন-ডিটেকটর

এক্স-রে কিভাবে পরিমাপ করা যায়?

এক্স-রে বিকিরণ এক ধরনের অদৃশ্য তেজ বা আলোক। এটা পরিমাপ করা সহজ নয়। তারপরেও বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে এমন কিছু ইলেকট্রোনিক যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন, যেগুলোর সাহায্যে অতি সহজে বিকিরণের উপস্থিতি ও পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। সেগুলোর নাম রেডিয়েশন-ডিটেকটর।

এক্স-রে বিকিরণ বিজ্ঞানের এক বিস্ময়কর আবিষ্কার। মানব কল্যাণে এর বহুমুখী প্রয়োগ রয়েছে। কিন্তু অতি মাত্রায় বিকিরণ ক্ষতিকর, সুস্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ। রাস্তা-ঘাটে চলার সময় আমরা প্রতিনিয়ত বিকিরণের সম্মুখীন হচ্ছি। তার নাম বেকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন। পরিবেশে বিকিরণ ছড়াচ্ছে বহু স্থান হতে। যেমন–এক্স-রে ক্লিনিক, নিউক্লিয়ার মেডিসিন সেন্টার, রেডিও আইসোটোপ কেন্দ্র, নিউক্লিয়ার প্ল্যান্ট, রিয়েকটর, পারমাণবিক অস্ত্রাগার বা বিস্ফোরণ ক্ষেত্র ইত্যাদি। কল্যাণকর দিকটি বিবেচনা করে মানুষকে নিত্যদিন বিকিরণ ক্ষেত্রে কাজ করতে হচ্ছে। সেজন্য বিকিরণের মাত্রা সম্পর্কে সচেতন মানুষকে ওয়াকিফহাল থাকা দরকার।

বিভিন্ন যন্ত্রের সাহায্যে বিকিরণ পরিমাপ করা যায়। তাদের কয়েকটির নাম নিম্নে দেয়া হলো ঃ

banglainternet.com

১। গায়গার মুলার কাউন্টার;

২। সিনটিলেশন ডিটেক্টর;

৩। ফিল্ম ব্যাজ;

৪। টি.এল.ডি. (থার্মো লুমিনিসেন্ট ডোজিমিটার);

৫। পকেট ডোজিমিটার;

৬। সিরামিক ডোজিমিটার ইত্যাদি।

বিভিন্ন ডিটেকটরের কার্যপ্রণালী ভিন্ন ভিন্ন রকমের। জি.এম. কাউন্টার সার্ভেমিটার হিসেবে কোন স্থান, ল্যাবরেটরী, পরিবেশ বা অফিসে রেডিয়েশন-জরীপের কাজে ব্যবহৃত হয়। ফিল্ম ব্যাজ, পকেট ডোজিমিটার কিংবা টি.এল.ডি. পার্সোনাল রেডিয়েশন মনিটরিংয়ের কাজে লাগে।

সিটি-স্ক্যান ঃ এক অত্যাধুনিক রঞ্জনরশ্মি প্রযুক্তি

সিটি স্ক্যানের পুরো নাম কম্পিউটারাইজড টমোগ্রাফী স্ক্যান। এটা চিকিৎসা ক্ষেত্রে এক অত্যাধুনিক রঞ্জন রশ্মি প্রযুক্তিবিদ্যা। এর দ্বারা বহু মারাত্মক রোগ নির্ণয় করা সহজ হয়েছে।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে জার্মান পদার্থবিদ কনরাড রঞ্জন এক্স-রে বা রঞ্জন রশ্মিকে প্রথম মানব কল্যাণে প্রয়োগ করেন। তারপর থেকে এ রশ্মিটি মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত হতে থাকে। অবশ্য প্রথম দিকে এর অসতর্ক ব্যবহারের কারণে কিছু ক্ষয়ক্ষতিও হয়েছে। ১৮৯৬ সালের দিকে এক্স-রে ফ্লুরোস্কোপ যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়। আর সবশেষে সত্তুরের দশকে মানব কল্যাণে সিটি স্ক্যান আবিষ্কৃত হয়।

টমোগ্রাফীতে এক্স-রের সাহায্যে বিভিন্ন কৌণিক অবস্থান হতে টিউমার বা ক্ষতস্থানের অনেকগুলো ছবি গ্রহণ করা হয় এবং ছবিগুলোকে যুক্ত করে ত্রিমাত্রিক অবস্থান ঠিক করা হয়। কম্পিউটারের সাহায্যে খাঁটি গাণিতিক উপায়ে ছবিগুলোকে জুড়ে দিয়ে গঠন করা হয় ত্রিমাত্রিক প্রতিবিম্ব। ফলে রোগ নির্ণয় করতে চিকিৎসককে আর অসুবিধায় পড়তে হয় না।

ব্রেইনের রোগ নির্ণয় আসলেই কঠিন। বিশেষ করে রোগী যখন আধা অজ্ঞান বা পুরো অজ্ঞান থাকে, তখন কেবলমাত্র রোগের ইতিহাস এবং নিদানিক চিহ্নাদি দিয়ে রোগের বিষয়ে একশভাগ নিশ্চিত হওয়া যায় না। তখন বাধ্য হয়ে চিকিৎসককে কিছু অত্যাবশ্যকীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার আশ্রয় নিতে হয়। তার মধ্যে সিটি স্ক্যান অন্যতম। ব্রেইনের জটিল ব্যাধির মধ্যে রয়েছে টিউমার, এবসেস বা ফোঁড়া, রক্ত জমাট বাঁধা, ব্রেইনের শোথজনিত স্ফীতি কিংবা কিয়দংশ নষ্ট হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। এসব রোগ নির্ণয়ে সিটি স্ক্যানের প্রয়োগ ক্রমেই বেড়ে চলছে। বিশেষ করে ব্রেইন ও হৃৎপিণ্ডে অস্ত্রোপচারের ব্যাপারে টমোগ্রাফীর সাহায্য গ্রহণ না করলে একেবারেই চলে না।

banglainternet.com

প্রথম যুগে সিটি স্ক্যান শুধু মস্তিষ্কের রোগ নির্ণয়ে ব্যবহৃত হতো। তারপর ধীরে ধীরে প্রযুক্তি উন্নত হলো। যন্ত্রের সাইজ বড় হলো। একই সাথে কার্যকারিতার

পরিসীমাও বৃদ্ধি পেল। বর্তমানে এটা দিয়ে দেহের যে কোন স্থান পরীক্ষা করা যায়। পরীক্ষাকালীন সময়ে রোগী কোন ব্যথা পায় না। ঝুঁকিও নগণ্যতম।

ব্রেইন ছাড়াও বক্ষ পিঞ্জর এবং উদর গহবরেও রয়েছে সিটি স্ক্যানের অবাধ গতিশীলতা। পেটের আভ্যন্তরীণ মূল্যবান অঙ্গ যেমন—লিভার, কিডনি, পিত্তথলি, অগ্নাশয় ইত্যাদির রোগ নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা যায় সিটি স্ক্যানের দ্বারা। সম্প্রতি কালার স্ক্যানার বেরিয়েছে। তা দিয়ে সাদা-কালো ছবির বদলে রঙিন ছবি তোলা যায়।

সিটি স্ক্যানের প্রধান অংশ চারটি। যথা–গেনট্রি, টিভি মনিটর, কম্পিউটার ইউনিট ও কন্ট্রোল সেট। গেনট্রির মধ্যে প্রধান অংশ দু'টি : এক্স-রে টিউব ও কৃষ্টাল ডিটেকটর। এ দু'টো একটা বৃত্তাকার চাকতির মধ্যে সজ্জিত থাকে। রোগীর দেহের যে অংশটি পরীক্ষা করতে হবে তা গেনট্রি রিঙের ভেতর ঢুকিয়ে দেয়া হয়। সিটি স্ক্যানের প্রধান মূলনীতি হচ্ছে এক্স-রে টিউবটি রোগীর চারপাশে ঘুরে। কৃষ্টাল ডিটেকটর ঘুরে অথবা স্থির থাকে। টিউবটি রোগীর চারপাশে একবার ঘুরে আসতে অর্থাৎ ৩৬০° অতিক্রম করতে সময় লাগে মাত্র ২-৫ সেকেণ্ড।

টমোগ্রাফী রেডিওগ্রাফী হতে আলাদা। এখানে অধিকতর বেশি সংবেদ্য রঞ্জন রশ্মি ব্যবহার করা হয়। খুবই কম পরিমাণে রশ্মি দেহে শোষিত হয়। অন্যদিকে প্রচলিত রেডিওগ্রাফীর তুলনায় রশ্মির ঘনত্ব সিটি স্ক্যানে স্টান্ডার্ড ফিল্মে ২০-২০০০ বা আরো বেশি গুণ ঘনত্বে প্রয়োগ করা সম্ভব। রশ্মির ঘনত্ব নিখুঁতভাবে প্রতিফলিত হয়, যার সাহায্যে বিভিন্ন নরম কলাগুচ্ছকে আলাদাভাবে সনাক্ত করা সম্ভব।

এক্স-রে টিউবটি রোগীর চারপার্শ্বে ঘুরে বিভিন্ন কৌণিক অবস্থান হতে বিবিধ প্রস্থচ্ছেদে ছবি গ্রহণ করে। প্রাপ্ত ডাটা কম্পিউটারের সাহায্যে ছবিতে পরিণত হয়। সেটা ভেসে ওঠে টেলিভিশনের পর্দায়। পাশের ক্যামেরা ইউনিট হতে ফটো বেরিয়ে আসে। গাণিতিক ডাটা সংরক্ষিত করা হয় ম্যাগনেটিক টেপে। রেডিওগ্রাফার কন্ট্রোল রুম হতে ফটোর সংখ্যা ও প্রকৃতি নির্ধারণ করে।

সিটি স্ক্যানে রশ্মি ঘনত্বের একটা বিশেষ পরিমাপ আছে। কলাতন্ত্রের প্রকৃতির ওপর রশ্মির ঘনত্ব নির্ভর করে। রশ্মি ঘনত্বকে হাউন্সফিল্ড ইউনিটে পরিমাপ করা হয়। সিটি স্ক্যানে পানির ঘনত্ব জিরো, বায়ুর ঘনত্ব মাইনাস ১০০০ আর অস্থির ঘনত্ব প্লাস ১০০০ ইউনিট। কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ঘনত্বের প্রয়োগ ও পরিমাপ করা হয়। যে নির্দিষ্ট ঘনত্বে ছবি তৈরি হয়, তার নাম "WINDOW-WIDTH"।

এক্স-রের সাহায্যে ত্রিমাত্রিক প্রতিবিম্ব তৈরির ব্যাপারে প্রথম গবেষণা শুরু করেন অষ্ট্রিয়ার গণিতজ্ঞ ডঃ জে. রাদোন। তারপর ১৯২২ সালে কয়েকজন বিজ্ঞানীর চেষ্টায় ত্রিমাত্রিক প্রতিবিম্ব তৈরি সম্ভব হয়। তার কিছু সময় পর ইংল্যান্ডের প্রযুক্তিবিদ নিউবোল্ড হাউনসফিল্ড ই. এম. আই. যন্ত্রের সাহায্যে ফটোগ্রাফীর ফিল্মে এক্স-রে ব্যবহার করে একাধিক ত্রিমাত্রিক ছবি উঠাতে সক্ষম হন। অবশেষে দক্ষিণ আমেরিকার পদার্থ

banglainternet.com

বিজ্ঞানী এলেন ম্যাকলিওড করম্যাক টমোগ্রাফীতে কম্পিউটারের সাফল্যজনক ব্যবহার নিয়ে গবেষণা করেন।

অবশেষে ১৯৭৩ সালে হাউন্সফিল্ড প্রথম সিটি স্ক্যান তৈরি করেন এবং সেটি চালু হয় ইংল্যান্ডে। সে বছরেই প্রচুর অর্থের বিনিময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি মেশিন ক্রয় করে বিখ্যাত মেয়ো ক্লিনিকে স্থাপন করে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে এ অসামান্য অবদানের জন্য ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দে হাউন্সফিল্ড ও করম্যাককে যৌথভাবে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়।

বিকিরণ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

বিকিরণ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ঃ ১. রোগীর দেহে সম্ভব মতো কম বিকিরণ প্রয়োগ, হেলথ টেকনোলজিষ্টকে বিকিরণ মুক্ত রাখা এবং জনসাধারণকে অবাঞ্ছিত বিকিরণ হতে রক্ষা করা।

বিকিরণ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রধান চারটি উপায় ঃ ১. বিকিরণের উৎস হতে বেশি দূরত্বে অবস্থান, ২. লেড-শিলডিং ব্যবহার, ৩. এক্স-রে প্রক্ষেপণের সময় কমানো এবং ৪. রেডিও ফার্মাসিউটিক্যালস-এর কার্যকারিতা সীমিতকরণ।

জনসাধারণকে অবাঞ্ছিত বিকিরণ হতে রক্ষা করার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। ফিল্টারযুক্ত এক্স-রে মেশিন হতে চারপার্শে কম বিকিরণ ছড়ায়। এক্স-রে কক্ষ হতে যাতে বিকিরণ বাইরে যেতে না পারে সেজন্য রশ্মির গতিপথের সামনের দেয়াল দশ ইঞ্চি কংক্রীট দিয়ে নির্মিত হতে হবে। এছাড়াও দেয়ালের গায়ে সীসার পাতলা পাত (১/১৬ ইঞ্চি) ব্যবহার করেও রঞ্জন রশ্মির গতিপথ ঠেকানো যায়।

ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে সীসার তৈরি বিভিন্ন জিনিস ব্যবহার করা হয়। যেমন— লেড এপ্রোনের সাহায্যে তলপেট এবং জনন অঙ্গসমূহকে বিকিরণের হাত হতে বাঁচানো যায়। গলগ্রন্থি বা থায়রয়েড গ্ল্যান্ডের উপর বিকিরণের ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে। এটা প্রতিরোধ করা যায় 'লেড-কলার' গলায় ব্যবহার করে। আবার চোখকে রক্ষা করার জন্য ব্যবহৃত হয় লেড গগলস। হাতে পরা যায় লেড গ্লোবস। তাই রেডিওগ্রাফার বা হেলথ-টেকনোলজিষ্টদের উচিত সব সময় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতন থাকা।

এক কথায়, ওয়াল প্রটেকশন, শিলডিং, দূরত্ব বাড়ানো, কম এক্সপোজার সময়, হাই কিলোভোল্টের ব্যবহার, উন্নত ফিল্ম প্রসেসিং ইত্যাদির মাধ্যমে রেডিও গ্রাফারকে অতিরিক্ত বিকিরণ হতে বাঁচানো যায়।

banglainternet.com

রোগীদের জন্য আরো কিছু বাড়তি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে। যেমন—

১. এক্স-রে বীম ফিল্টেশন, ২. কলিমেটরের সাহায্যে বীম সীমিতকরণ, ৩. সীসার কভার ব্যবহার, ৪. হাই স্পীড স্ক্রীনের সাহায্যে ছবি নেয়া; ৫. উচ্চ কিলোভোল্টে সতর্ক পদ্ধতিতে প্রতিবিম্ব তৈরি..... ইত্যাদি।

বিশেষ প্রয়োজন না হলে গর্ভাবস্থায় তলপেটের এক্স-রে করা নিষিদ্ধ। এতে গর্ভস্থ সন্তানের ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে।

এক্স-রে কুইজ–৪

বলুন দেখি

১। মেমোগ্রাফী কাকে বলে?
২। এক্স-রে কেন ক্ষতিকর?
৩। এক্স-রে কখন বিপদজনক?
৪। মেমোগ্রাফী কেন কম কিলোভোল্টে করা হয়?
৫। এম.পি.ডি. বলতে কি বুঝায়?
৬। কনট্রাষ্ট মেটেরিয়াল কাকে বলে?
৭। কন্ট্রাষ্ট মেটেরিয়ালের উদাহরণ দিন।
৮। মেমোগ্রাফীতে মলিবডেনাম ধাতু ব্যবহারের সুবিধা কি?
৯। সিটি স্ক্যান বলতে কি বুঝায়?
১০। সিটি স্ক্যান কে আবিষ্কার করেন?
১১। রেডিয়েশন ডিটেকটর কাকে বলে?
১২। কয়েকটি রেডিয়েশন ডিটেকটরের নাম করুন?
১৩। মেমোগ্রাফীতে টাংষ্টেন টার্গেট ব্যবহারের অসুবিধা কি?
১৪। সিটি স্ক্যান সাধারণ এক্স-রে হতে ভাল কেন?
১৫। এম.পি.ডি. কত?
১৬। সিনটিলেশন ডিটেকটর দিয়ে কোন্ ধরনের বিকিরণ নির্ণয় করা যায়?
১৭। বেরিয়াম সালফেট কি কাজে লাগে?
১৮। বিকিরণ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য কি?
১৯। বিকিরণ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রধান চারটি উপায় কি কি?
২০। আয়োডিন যুক্ত রঞ্জক পদার্থ কি কি? কি কাজে লাগে?
২১। কন্ট্রাষ্ট মেটেরিয়ালের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াসমূহ কি কি?
২২। জনসাধারণকে অপ্রয়োজনীয় বিকিরণ হতে কিভাবে রক্ষা করা যায়?
২৩। রেডিওগ্রাফারের জন্য বিকিরণ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কি কি?
২৪। মাঠ জরীপের কাজে কোন্ রেডিয়েশন-ডিটেকটর ব্যবহার করা হয়?
২৫। পার্সোনাল রেডিয়েশন মনিটর কি কি?

banglainternet.com

তেজস্ক্রিয় সাম্যাবস্থা

তেজস্ক্রিয় পদার্থসমূহ তেজ বিকিরণ করতে করতে যে হারে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, ঠিক সে হারেই পরবর্তী মৌলের গঠনক্রিয়া চলতে থাকে। উক্ত ক্ষয় ও গঠন ক্রিয়ার মাঝামাঝি অবস্থায় এক সময় উভয়ের কার্যকারিতা সমান থাকে। এর নাম তেজস্ক্রিয় সাম্যাবস্থা। ইংরেজিতে রেডিও একটিভ ইকুইলিব্রিয়াম।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় কোবাল্ট–৬০ এর কথা। এটা তেজ বিকিরণ করতে করতে এক সময় নিকেল হয়। উক্ত তেজস্ক্রিয় রূপান্তর প্রক্রিয়ার মাঝামাঝি অবস্থায় এক সময় উভয় মৌল সমান কার্যকারিতা প্রদর্শন করে।

তেজস্ক্রিয় সাম্যাবস্থা দু'ধরনের। যথা ঃ ১। সেকুলার বা দীর্ঘমেয়াদী; ২। ট্রানজিয়েন্ট বা স্বল্পমেয়াদী। দীর্ঘ মেয়াদী সাম্যাবস্থার উদাহরণ রেডিয়াম। এর অর্ধজীবন ১৬২২ বছর। এই দীর্ঘ সময়ের কারণে সাম্যাবস্থা দীর্ঘমেয়াদী হয়। স্বল্পমেয়াদী সাম্যাবস্থার উদাহরণ রেডন, যার অর্ধজীবন মাত্র ৩·৮৬ দিনে শেষ হয়। এত কম সময়ের কারণে সাম্যাবস্থা স্বল্পমেয়াদী হয়।

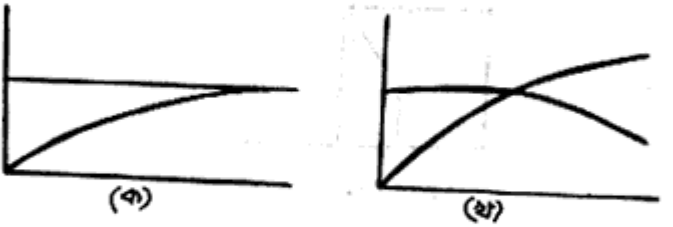

গ্রাফ ঃ ক) দীর্ঘমেয়াদী সাম্যাবস্থা খ) স্বল্পমেয়াদী সাম্যাবস্থা

ফিল্মে বিকিরণ প্রক্ষেপনের পরিমাপ

আলোক বা বিকিরণের প্রতি ফিল্ম ইমালশনের একটা সংবেদনশীলতা রয়েছে। এর নাম ফিল্ম স্পীড বা ফিল্ম সেনসিটিভিটি।

এক্স-রে ফিল্মে বিকিরণ প্রক্ষেপণ করাকে 'এক্সপোজার' বলে। এটা টিউব কারেন্ট ও প্রক্ষেপন-সময়ের গুনফলের সমান। ধরা যাক, টিউব-কারেন্ট ৫০ মিলি এম্পিয়ার এবং এক্সপোজার সময়ের পরিমাণ ১০ সেকেন্ড। অতএব, ফিল্ম এক্সপোজার = টিউব কারেন্ট × এক্সপোজার সময়। = ৫০ × ১০ = ৫০০ মিলি-এম্পিয়ার-সেকেন্ড। এক্সপোজারের একক = এম.এ. - এস.। অন্যকথায় 'রঞ্জন'।

পদার্থের ভেতর এক্স-রে বীমের অনুপ্রবেশকারী গুনাগুণকে 'কোয়ালিটি অব এক্স-রে' বলে। এটা শতকরা হিসেবে প্রকাশ করা হয়।

কোয়ালিটি অব এক্স-রে = ফিল্মে রশ্মির পরিমাণ÷দেহে রশ্মির পরিমাণ × ১০০।

ধরা যাক, ফিল্মে রশ্মির পরিমাণ = ০.২০ রেম।

banglainternet.com

দেহে রশ্মির পরিমাণ = ১.০০ রেম।

অতএব, কোয়ালিটি অব এক্স-রে = ০.২০ ÷ ১.০০ × ১০০ = ২০%

এক্স-রে এক্সপোজার ও ফিল্ম-ঘনত্বকে একটা গ্রাফের সাহায্যে প্রকাশ করা যায়। সেখানে গ্রাফের 'X' অক্ষ বরাবর লগ রিলেটিভ এক্সপোজার এবং 'Y' অক্ষ বরাবর ঘনত্ব স্থাপন করা হয়। তাতে কার্ভের একটা বিশেষ চেহারা ফুটে ওঠে। ছবতে তা দেখানো হয়েছে। কার্ভটির নাম 'কারেকটারিস্টিক কার্ভ'। কার্ভের প্রধান অংশ তিনটি।

১। টো-অংশ (TOE) : এটা কার্ভের নীচের অংশ। এটা কম এক্সপোজার এলাকা।

২। স্টীপ পার্ট (STEEP) : এটা মাঝামাঝি অংশ। এটা স্বাভাবিক এক্সপোজার নির্দেশক। এর মান ০.৫ – ২.০।

৩। সোলডার অংশ (SHOULDER) : এটা কার্ভের একেবারে উপরের অংশ। এটা অতিরিক্ত এক্সপোজার এলাকা। এতে ফিল্ম কালো হয়ে যায়।

এক্সপোজারের পরিমাণ লগারিদমের সারণীতে ব্যাখ্যা করা হয়। এতে হিসাব নিকাশ করতে সুবিধা। উপরন্তু সংক্ষিপ্ত গ্রাফে অনেক বৃহত্তর হিসাব সম্পাদন সম্ভবপর হয়।

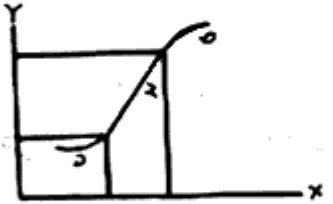

এক্স-রে ফিল্ম : কারেকটারিস্টিক কার্ভ
১। কম এক্সপোজার এলাকা,
২। স্বাভাবিক এক্সপোজার এলাকা,
৩। বেশি এক্সপোজার এলাকা।

রেডিও গ্রাফিক কন্ট্রাষ্ট

এক্স-রে ফিল্মের উপর বিকিরণ প্রক্ষেপণের পর বিভিন্ন পদক্ষেপে ডার্করুম প্রসেসিং শেষে ফিল্মের বিভিন্ন স্থানে ঘনত্বের যে পার্থক্য থাকে, তার নাম রেডিওগ্রাফিক কন্ট্রাষ্ট।

রেডিও গ্রাফিক কন্ট্রাষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। সেগুলোকে সামগ্রীকভাবে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ১। সাবজেক্ট কন্ট্রাষ্ট : এটা বস্তু বা বিষয়ের বিভিন্ন অবস্থার উপর নির্ভরশীল। ২। ফিল্ম কন্ট্রাষ্ট : এটা ফিল্মের গুণাগুন ও বিভিন্ন অবস্থার সাথে সম্পর্কিত।

সাবজেক্ট-কন্ট্রাষ্ট বিভিন্ন ফ্যাকটরের উপর নির্ভরশীল। যথা : ১। বস্তুর আনবিক সংখ্যা : এটা বেশি হলে ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্ট বেশি হয়। ২। পুরুত্ব

banglainternet.com

(Thickness) ঃ এটা বেশি হলে ভাল কন্ট্রাষ্ট পাওয়া যায় না। ৩। ঘনত্ব (Density) ঃ এটা বেশি হলে ফগিং বেশি হয় ও ফিল্ম কালো বর্ণ ধারণ করে। ৪। কেভি (কিলো ভোল্টেজ) ঃ কেভি বেশি হলে কন্ট্রাষ্ট ভাল হয়। ৫। কন্ট্রাষ্ট মেটেরিয়ালের ব্যবহার ঃ এতেও ফিল্মের গুণাগুন ভাল হয়।

ফিল্মের গুণাগুন ও বিভিন্ন অবস্থার সাথে সম্পর্কিত যেসব ফ্যাক্টরসমূহ কন্ট্রাষ্ট নিয়ামক হিসাবে কাজ করে, সেগুলোকে ফিল্ম-কন্ট্রাষ্ট বলে। যথা ঃ ১। বেস- ডেনসিটি (Base-Density) ঃ ফিল্ম তৈরির সময় ইমালশন-স্তর কিছু কিছু আলোক শোষণ করে নেয়। ফিল্ম ডেভেলপের পর সেটাও ডেভেলপড হয়ে যায়। এর নাম বেস -ডেনসিটি। ২। ফগিং (Fogging) ঃ এটা উঁচু ভোল্টেজে হয়। এতে ফিল্ম প্রয়োজনের অতিরিক্ত কালো হয়ে যায়।

সিনটিলেশন ডিটেকটর

এটা এক ধরণের বিকিরণ পরিমাপক যন্ত্র। আলোক বিস্ফুরণ প্রক্রিয়ায় এটা কাজ করে। এর সাহায্যে গামা রশ্মি পরিমাপ করা যায়। তবে আলফা ও বিটা রশ্মিও নির্ণয় এবং পরিমাপ করা সম্ভব।

সিনটিলেশন ডিটেকটরের প্রধান অংশ দুটি ঃ ১। কৃষ্টাল, ২। ফটো-মাল্টি প্লায়ার টিউব। কৃষ্টাল সামনের অংশে বসানো থাকে। এটা সোডিয়াম আয়োডাইড ও থ্যালিয়াম সমন্বয়ে তৈরী। ফটো ম্যাল্টিপ্লায়ার টিউবের প্রধান অংশ তিনটি ঃ ক) ফটো ক্যাথোড, খ) ডাইনোডস (১০-১২টা) এবং গ) বায়ুশূন্য কাঁচনল।

বিকিরণ সোডিয়াম আয়োডাইড কৃষ্টালে শোষিত হবার পর সেটা ফটো ক্যাথোডে প্রতিফলিত হয়। বায়ুশূন্য কাঁচনলের ভেতর আলোক রশ্মি একের পর এক ডাইনোডে প্রতিফলিত হতে থাকে। আর সাথে সাথে বাড়তে থাকে শক্তি ও ইলেক্ট্রন সংখ্যা।

এভাবে বহু আলোক-বিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। প্রতিটি বিক্রিয়ায় + ১০০ ভোল্ট কারেন্ট বেশি উৎপন্ন হয়। সবশেষে ইলেক্ট্রনের সংখ্যা দাঁড়ায় ১০^{৬} (টেন টু দি পাওয়ার সিক্স)। আলোকের পরিমাপ করে বিকিরণের ডোজ জানা যায়।

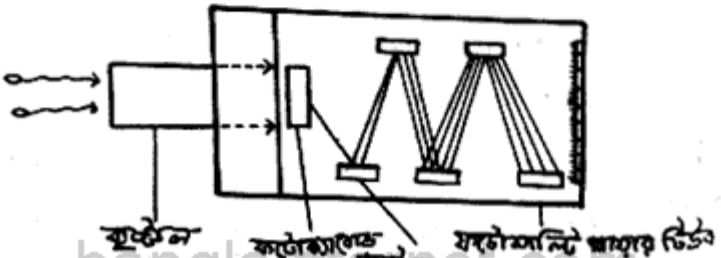

banglainternet.com

সিনটিলেশন-ডিটেকটর

রেডিয়েশন ডিটেকটর ঃ টি. এল ডি.

টি. এল. ডি. মানে "থার্মো-লুমিনিসেন্ট ডোজিমিটার"। এর সাহায্যে এক্সরে, গামা-রে, বিটা রশ্মি, ইলেকট্রন, প্রোটন ইত্যাদি পরিমাপ করা যায়। এর পরিমাপক সীমা দশ মিলিরঞ্জন হতে এক লক্ষ রঞ্জন।

কিছু কিছু পদার্থ আছে, যারা বিকিরণ শোষণের পর সেগুলোকে খুব উচ্চ তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে দৃশ্যমান আলোক বিকিরণ করে। সেসব পদার্থের মধ্যে ক্যালসিয়াম ফ্লোরাইড ও লিথিয়াম ফ্লোরাইড অন্যতম। এরা বিকিরণ শোষনের পর ইলেকট্রন বিস্ফুরিত হয় এবং পরমাণুর কক্ষপথে গর্তের সৃষ্টি হয়। সেসব গর্তে শক্তি সঞ্চিত হয় এবং পরমানুটি উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

সে উত্তেজিত পরমানুকে কয়েকশ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে সেটা দৃশ্যমাণ আলোক বিকিরণ করে। সেই বিকীর্ণ আলোক ফটোমাল্টিপ্লায়ার টিউবে সঞ্চালিত করে পরিমাপ করা হয়। আলোক রশ্মির পরিমাপ হতে বিকিরণের ডোজ সম্পর্কে ধারণা নেয়া যায়।

টি.এল.ডি. ব্যবহারের সুবিধা অনেক। এটা সাইজে ছোট, দামেও সস্তা। সঠিক রিডিং দেয়। এর সাহায্যে বিস্তীর্ণ সীমায় বিকিরণ পরিমাপ করা যায়। এটা অলংকারের সাথেও পরা যায়।

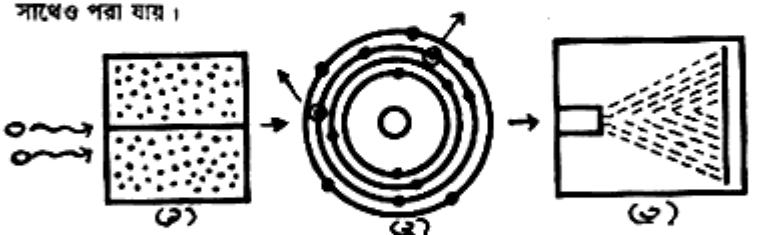

টি. এল. ডি.র মূলনীতি

১। কৃষ্টাল ঃ ক্যালসিয়াম ফ্লোরাইড ও লিথিয়াম ফ্লোরাইড
২। এনার্জি শোষণ, ইলেকট্রন বিস্ফুরন ও কক্ষপথে গর্তের সৃষ্টি
৩। তাপিত করণ ও আলোক বিকিরণ।

রেডিয়েশন ডিটেকটর ঃ পকেট ডোজিমিটার

পকেট ডোজিমিটার এক বিশেষ ধরণের বিকিরণ পরিমাপক যন্ত্র। এর আকৃতি ফাউন্টেন পেনের মতো। এটা পকেটে পরা যায়। বিকিরণ ক্ষেত্রে পার্সোনাল মনিটরিংয়ের কাজে এটা ব্যবহৃত হয়। এর বিকিরণ নির্ণায়ক সীমা শূন্য হতে দু'শ মিলিরঞ্জন।

পকেট ডোজিমিটার দুই ধরনের। যথা ঃ ১। কনডেনসার টাইপ এবং ২। ডায়রেক্ট টাইপ। কনডেনসার টাইপে আলাদা ইলেকট্রোমিটার থাকে। কিন্তু ডায়রেক্ট টাইপে যন্ত্রের ভেতর পরিমাপক স্কেল সেট করা থাকে। এক্স-রে, গামা রশ্মির ডোজ নির্ণয়ের জন্য এটা ব্যবহৃত হয়।

আগেই বলেছি, এটা দেখতে কলমের মতো। চারদিকে ৪.৭৫ মিলিমিটার পুরু প্লাস্টিক থাকে। ভেতরে একখানি লম্বা তার থাকে, যার নাম কোএক্সিয়াল। এটা এনোড বা পজেটিভ হিসেবে কাজ করে। এয়ার ওয়াল নেগেটিভ হিসেবে কাজ করে। ইনসুলেটরের সাহায্যে এনোডকে আলাদা করে রাখা হয়। এক পার্শ্বে ডায়াফ্রাম বা ফটক থাকে।

ডায়াফ্রামের ছিদ্রপথে ভেতরে বিকিরণ প্রবেশ করার পর বিকিরণের কোটন কণার সাথে এয়ার ওয়ালের ক্রিয়া-বিক্রিয়া হয়। তাতে এনোড বা পজেটিভ পোলের পটেনশিয়াল হ্রাস পায়। যত বেশি আয়োনাইজেশন ঘটে, তত বেশি এনোড-পটেনশিয়াল হ্রাস পায়। এই হ্রাসের পরিমাণ ইলেক্‌ট্রোমিটার স্কেলে মিলিরঞ্জনের আকারে ডোজ নির্দেশ করে।

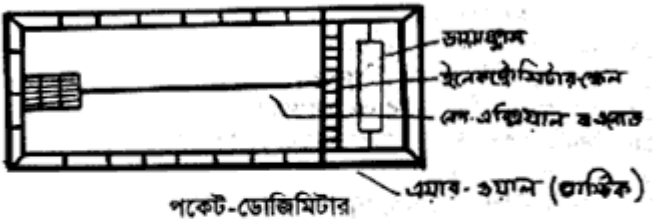

পকেট-ডোজিমিটার

ফিল্ম-বেজ কি কাজে লাগে?

ফিল্ম বেজ (FILM-BADGE) ৩০ × ৪০ মিলিমিটার সাইজের ফিল্ম যা বিকিরণের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়। এর ঘনত্ব পরিমাপ করে বিকিরণের ডোজ সম্পর্কে ধারণা নেয়া যায়।

ফিল্মে সিলভার ব্রোমাইড কৃষ্টাল তাকে। এতে বিকিরণের প্রভাবে অদৃশ্য প্রতিচ্ছবি তৈরী হয়, যা ডেভেলপিং ও ফিক্সিং করার পর কালো ধাতব সিলভারে পরিণত হয়। ডেনসিটোমিটার নামক যন্ত্রের সাহায্যে ফিল্মের ঘনত্ব পরিমাপ করা যায়। সেই ঘনত্ব হতে বিকিরণের ডোজ সম্পর্কে ধারণা নেয়া সম্ভব।

একটা গ্রাফের সাহায্যে বিকিরণের ডোজ ও ফিল্মের ঘনত্ব পরিমাপ করা যায়। তাকে ডোজ-ডেনসিটি কার্ভ বলে। গ্রাফের 'X'-অক্ষ বরাবর ডোজ সেট করা হয়। 'Y' অক্ষ বরাবর অপটিক্যাল ডেনসিটি বসানো হয়। তাতে একটি বিশেষ ধরনের কার্ভ পাওয়া যায়, যা দেখে বিকিরণের মাত্রা সম্পর্কে ধারণা নেয়া যায়।

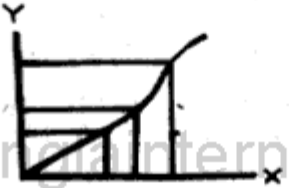

banglainternet.com

ডোজ ডেনসিটি কার্ভ

এক্স-রে কুইজ—৫

১। তেজস্ক্রিয় সাম্যাবস্থা কাকে বলে?
২। তেজস্ক্রিয় সাম্যাবস্থা কয় ধরণের?
৩। ফিল্ম স্পীড কি?
৪। ফিল্ম এক্সপোজার বলতে কি বুঝায়?
৫। এক্সপোজারের একক কি?
৬। কোয়ালিটি অব এক্স-রে কিভাবে প্রকাশ করা হয়?
৭। সাবজেক্ট -কন্ট্রাষ্ট কাকে বলে?
৮। রেডিও গ্রাফিক কন্ট্রাষ্ট কি?
৯। সাবজেক্ট কন্ট্রাষ্ট কি কি ফ্যাকটরের উপর নির্ভরশীল?
১০। ফগিং কি? কেন হয়?
১১। কিভাবে ফিল্ম ফগিং দূর করা যায়?
১২। বেস ডেনসিটি বলতে কি বুঝায়?
১৩। রেডিয়েশন- ডিটেকটর কয় ধরণের?
১৪। সিনটিলেশন ডিটেকটরের সাহায্যে কি কি বিকিরণ পরিমাপ যোগ্য?
১৫। টি.এল.ডি. মানে কি?
১৬। সিনটিলেশন- ডিটেকটরের কয়টি অংশ?
১৭। টি.এল.ডি.র মূলনীতি ব্যাখ্যা করুণ।
১৮। ফিল্ম ব্যাজ কি কাজে লাগে?
১৯। সিনটিলেশন ডিটেকটরে ব্যবহৃত কৃষ্টালের নাম কি?
২০। পকেট ডোজিমিটারের কাজ কি?
২১। পকেট- জোজিমিটার কয় ধরণের?
২২। পকেট ডোজিমিটার দেখতে কি রকম?
২৩। ফিল্ম ব্যাজে কি ধরনের কৃষ্টাল থাকে?
২৪। ডোজ ডেনসিটি কার্ভটি ব্যাখ্যা করুণ।
২৫। সিনটিলেশন মানে কি?
২৬। কারেকটারিষ্টিক কার্ভ কাকে বলে?
২৭। কারেকটারিষ্টিক কার্ভের কয়টি অংশ?
২৮। কার্ভে লগ ব্যবহারের সুবিধা কি?
২৯। ডাইনোডস কি? কোথায় থাকে?
৩০। টি. এল. ডি. ব্যবহারের সুবিধা কি?

গ্রন্থপঞ্জী

1. The Fundamentals of X-RAY & Radium Physics; 7th Edi. by Joseph selman
2. Christen's Physics of Diagnostic Radiology, 4th Editior, Thomas S. Curry.
3. The physics of Radiology; 4th Edition, Harold Elford Johns, J. R. Cunningham.

লেখক পরিচিতি

ডাঃ নাজমুল আলম ১৯৬২ সালের ২৮শে জানুয়ারী নোয়াখালী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮৭ সালে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হতে এম.বি.বি.এস. ডিগ্রী লাভ করেন। তারপর বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস স্বাস্থ্য ক্যাডারে সরকারী চাকুরীতে যোগদান করেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে তিনি মেডিক্যাল অফিসার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। সরকারী দায়ীত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞানভিত্তিক লেখা লিখছেন। ১৯৯৫ সালে ঢাকাস্থ জাতীয় হৃদরোগ ইনষ্টিটিউট ও হাসপাতাল হতে হৃদরোগের উপর স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। তারপর পিজি হাসপাতালে রেডিওলজি ও ইমেজিং বিষয়ে এম.ফিল. কোর্সে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি পিজি হাসপাতালে রেডিওলজি বিভাগে কর্মরত আছেন।